ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana®
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

# স্বস্তিকা

দাম : ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ৫ সংখ্যা ।। ৫ আশ্বিন, ১৪১৫ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১০) ২২ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ ।। Website : www.eswastika.com

# চার মাসে দেশের প্রধান চার শহরে বিস্ফোরণ

## আমেদাবাদ থেকে তথ্য পেয়েও দিল্লীর নিষ্ক্রিয়তা সন্দেহজনক

**নিজস্ব প্রতিনিধি** ।। দিল্লী কি 'কেবলই ঘুমায়ে রয়', নাকি সবকিছু জেনেও কেবল মুসলিম ভোটের জন্য চুপ করে থাকে, মানুষের বুকে হোলিখেলা দেখে? প্রশ্নটি আজ দেশজুড়ে। ২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর সংসদ ভবনে জঙ্গি আক্রমণ। এবার গত ১৩ সেপ্টেম্বর পাঁচ পাঁচটি ধারাবাহিক বিস্ফোরণ। মাঝে ২০০৫ সালের ২৯ অক্টোবর দিল্লীতে আরও একবার রক্তবন্যা। একের পর এক মারাত্মক ধরনের ধারাবাহিক বিস্ফোরণে নিরীহ ও নিরপরাধ মানুষের লাশের মিছিল তৈরি হয়েছে। অথচ সরকার কিছু জানতো না এটা একেকথায় তাহা মিথ্যে।

কয়েক দিন আগেই রাজস্থানের জয়পুরে এবং গুজরাটের আমেদাবাদে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে সিমি এবং হুজি জঙ্গিরা। এবার দিল্লী বিস্ফোরণের দায়ও বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করেছে সিমি। মাত্র কয়েক দিন আগেও যাদের পক্ষ নিয়ে দালালী করেছেন মুলায়ম সিং যাদব, লালু প্রসাদ যাদব, রামবিলাস পাশোয়ানের মতো মার্কামারা লোকেরা। এরা তিনজনই এখন কেন্দ্রে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকারের দোসর। তাহলে এই কারণেই কি কেন্দ্র অনেক খবর আগাম পেয়েও কোনওরকম প্রতিরক্ষা বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে গড়িমসি করেছে? এ প্রশ্নও এখন লোকের মুখে মুখে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পারা গেছে যে দিল্লী পুলিশ সাম্প্রতিক আমেদাবাদে বিস্ফোরণের পর অন্তত দু'বার সেখানে উড়ে গিয়েছিল। সেখানে এবং অন্যত্র বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত কমপক্ষে ১২ জনকে চিহ্নিত পাকড়াও করেছিল গুজরাটের নরেন্দ্র মোদীর প্রশাসন।

(এরপর ২ পাতায়)

## শিবরাজের মতো মন্ত্রীদের জন্যই জঙ্গিদের বাড়বাড়ন্ত

**যুগপুরুষ** ।। গত ১৩ সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় দিল্লীর বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় সারা দেশের মানুষ যখন স্তব্ধ তখন কেন্দ্রীয় কংগ্রেসী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিল টি ভি-র পর্দায় হিরো সাজতে পাঁচবার পাঁচ রকম পোশাকে ক্যামেরার সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। বোমা বিস্ফোরণ হয় সন্ধ্যা ৬-১০ থেকে ৬-৩৮ মিনিটের মধ্যে দিল্লীর জনবহুল পাঁচটি স্থানে। এরপরের তিন ঘণ্টায় পাঁচবার শিবরাজ পাতিল টিভি-র ক্যামেরার সামনে এসেছিলেন। প্রতিবারই নতুন পোশাকে, নতুন মেক আপে। এর থেকে একটা কথা স্পষ্ট যে জেহাদি ইসলামি বোমায় নিহত ও আহতদের প্রতি সমবেদনার থেকে তাঁর বেশি আগ্রহ নিজের দামি দামি প্রিন্স স্যুটের বাহার দেশবাসীকে দেখাতে। এই অতি অপদার্থ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর স্মরণেই নেই যে বিগত চার মাসের মধ্যে জয়পুর, ব্যাঙ্গালোর, আমেদাবাদ এবং দিল্লীতে একই জঙ্গি গোষ্ঠী বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে শতাধিক নিরপরাধ সাধারণ মানুষকে হত্যা করেছে। জয়পুরে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটে ১৩ মে। আর দিল্লীর বিস্ফোরণটিও ঘটেছে সেই ১৩ তারিখেই। শনিবার, ১৩ই সেপ্টেম্বর। অর্থাৎ ঠিক চার মাসের মধ্যে দেশের চারটি প্রধান শহরে সিরিয়াল বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে। অথচ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক 'সিমি' বা তথাকথিত 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের' খুনীদের ধরতে কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। শিবরাজ পাতিল অজুহাত দেখিয়েছেন যে অপরাধীদের ধরার কাজ সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের। কেন্দ্রের নয়। কেন্দ্র সাহায্য ও পরামর্শ দিতে পারে রাজ্য সরকারগুলিকে। শিবরাজের মতো অপদার্থ মন্ত্রীদের জন্যই আজ জঙ্গিদের এতটা বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। দিল্লীতে যে জঙ্গিরা বোমা বিস্ফোরণ ঘটাতে চলেছে তার আগাম খবর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে ছিল। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে টেলিফোন করে শিবরাজ পাতিলকে জানান যে আমেদাবাদ ও সুরাতে ধৃত জঙ্গিরা পুলিশকে জানিয়েছে দিল্লীতে সিমি-র জেহাদিরা শীঘ্রই হামলা চালাবে। বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর যে পরিকল্পনা জঙ্গিরা করেছে তার সাংকেতিক নাম BAD। ধৃতরা জানিয়েছে যে ব্যাঙ্গালোর আমেদাবাদ এবং দিল্লীর প্রথম ইংরেজি অক্ষরটি নিয়ে অন্তর্ঘাত পরিকল্পনার নাম দেওয়া হয় BAD। খবরটি পাওয়া মাত্রই নরেন্দ্র মোদী টেলিফোনে শিবরাজ পাতিলকে সতর্ক করেন। তারপর রাজ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের সব তথ্য লিখিতভাবে জানিয়ে

(এরপর ২ পাতায়)

রাজধানী দিল্লীতে বিস্ফোরণের একটি দৃশ্য।

## অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে বিদ্যার্থী পরিষদের বাংলাদেশ দূতাবাস অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। "বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী দূর হটো, বিদ্যার্থী পরিষদ দিচ্ছে ডাক অনুপ্রবেশকারী নিপাত যাক, বাংলাদেশ সাবধান — জাগছে ছাত্র, জাগছে জওয়ান।" এই স্লোগানে সোচ্চার হয়ে কয়েক হাজার ছাত্র-যুবক-তরুণ-বিদ্যার্থীর লাগাতার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বাংলাদেশী দূতাবাস অভিযানের ডাক দিয়েছিল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পশ্চিমবঙ্গ শাখা। সারা দেশ জুড়েই বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বহিষ্কারের দাবিতে কর্মসূচি নিয়েছে বিদ্যার্থী পরিষদ।

বিদ্যার্থী পরিষদের বাংলাদেশ দূতাবাস অভিযান। - ছবি : বাসুদেব পাল

মিছিল কলকাতার কলেজ স্কোয়ার থেকে পার্ক সার্কাসে বাংলাদেশ দূতাবাসের দিকে চলছিল। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের বহিষ্কার এবং বাংলাদেশ থেকে ভারতে গত ১০ সেপ্টেম্বর একযোগেই বাংলাদেশী দূতাবাস অভিযান রাজধানী দিল্লীতেও ছাত্র-যুবকরা করেছে।

এদিন সকাল থেকেই এ বি ভি পি লেখা মশাল চিহ্নিত গৈরিক পতাকা নিয়ে চারদিক থেকে ছাত্র যুবকদের মিছিল কলেজ স্কোয়ারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে গড়া মঞ্চের কাছে জড়ো হতে থাকে। বেলা দেড়টা নাগাদ বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন সহ বিদ্যার্থী পরিষদের মিছিল শুরু হয়। মিছিলের সামনের সারিতে ছিলেন সর্বভারতীয় নেতা সুনীল বনসল, রাজ্য সভাপতি রবিরঞ্জন সেন, শংকর মণ্ডল, অরিন্দম মুখার্জী সহ অন্যান্য নেতারা। তাদের সামনে নিয়ে বাংলাদেশ দূতাবাস অভিমুখে মিছিল রওনা দেয়। নেতাদের পিছনেই কয়েকশত ছাত্রী। সবার মুখে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ বিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদ বিরোধী স্লোগান। কলকাতার রাস্তায় অনুপ্রবেশ বিরোধী এত বিশাল মিছিল ইদানীংকালে দেখা যায়নি। লক্ষ্য করার মতো বিষয় হল, মিছিলের সামনে-পিছনে কোথাও কোনও রাজনৈতিক নেতাও ছিলেন না, যা একেবারেই ব্যতিক্রমী। বাংলাদেশীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় প্রদানকারী পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ যে বাংলাদেশ দূতাবাসের সামনে মিছিলকে যেতে দেবে না — এ আশঙ্কা উদ্যোক্তাদের ছিল। এবং সেটাই সত্য হল। তবে এত আগে পরপর দুটো ব্যারিকেড

(এরপর ১৬ পাতায়)

## চীনা মোবাইলে নিরাপত্তা সঙ্কটে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সস্তার চীনা মোবাইল দীর্ঘদিন ধরে ভারতের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করছিল। এবার চীনের 'মোবাইল' ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকেও বিপদগ্রস্ত করে তুলছে। এদেশের গোয়েন্দা বিভাগ ও নিরাপত্তা দপ্তরের শীর্ষস্থানীয় কর্তাব্যক্তিরা এই আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। সম্প্রতি দিল্লীতে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর পি সি হালদার স্বয়ং। এই চীনা-মোবাইল কীভাবে ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করছে এবং তা থেকে কীভাবে রক্ষা পাওয়া যায় সেই বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য একটি দীর্ঘ বৈঠক আহ্বান করা হচ্ছে। বৈঠকে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর ও নিরাপত্তা সংস্থার প্রমুখ কর্মকর্তা ছাড়াও প্রদেশ ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর পুলিশ প্রধান এবং মুখ্যসচিবরাও উপস্থিত থাকবেন।

উল্লেখ্য, একই বিষয়ে গত ৮ আগস্ট রাজধানীতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের সভাপতিত্বে একটি বৈঠকে পরবর্তী কর্মসূচি চূড়ান্ত করা হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের খবর, বন্যার জলের মতোই চীনা মোবাইল অপেক্ষাকৃত কম দামে ভারতের বাজার ইতিমধ্যে ছেয়ে ফেলেছে। বর্তমানে মোবাইলের মাধ্যমে সীম কার্ড অদল-বদল করেই সাধারণ অপরাধী থেকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী তথা গুপ্তচররা নিজেদের মধ্যে পরস্পর সংবাদ আদান প্রদান ও যোগাযোগ রাখে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন মোবাইল পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা এবং সি এস এন এল-এর কললিস্ট দেখে সহজেই অপরাধীদের অবস্থান ও কথাবার্তা পর্যন্ত সব্বর যোগাড় করা সম্ভব হয়। কিন্তু চীনা মোবাইলে তা করা

যাবে না। কেননা প্রত্যেক মোবাইলের একটি স্বতন্ত্র 'ইন্টারন্যাশন্যাল মোবাইল ইকুইপমেন্ট আইডেনটিটি' বা পরিচয় সূচক নম্বর ব্যবহার করতে হয়। চীনে তৈরি বা চীনা মোবাইল মাত্র তিনটি সাধারণ বা কমন আই এম ই আই-নম্বর ব্যবহার করে অসংখ্য মোবাইলের ক্ষেত্রে। সেই তিনটি নম্বর হল — ১০০, ১০০০ এবং ৫০০০।

সম্প্রতি ব্যাঙ্গালোর ও আমেদাবাদের পরপর ধারাবাহিক বিস্ফোরণে যে রিমোট কন্ট্রোল ফোন থেকে ফোন করা হয়েছিল তাতে চীনা মোবাইলই ব্যবহার করা হয়েছিল

(এরপর ২ পাতায়)

# সিঙ্গুর-ধর্না বুঝিয়ে দিল দিল্লীতে বিজেপি ছাড়া হালে পানি পাবেন না মমতা

**নিজস্ব প্রতিনিধি ।।** কোনও জাতীয় দলের সঙ্গে না থাকলে হাল কি হয় তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা

*মমতা ব্যানার্জী*

বন্দ্যোপাধ্যায়। সিঙ্গুরে টানা ১৫ দিন ধর্না চালালেন। তারপর রাজ্যপালের দয়ায় উঠে যাওয়ার পথ খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু আন্দোলনের শেষে তাঁর প্রাপ্তি কী? একটা বড় সাইজের অশ্বডিম্ব! বামফ্রন্ট সরকার তাঁকে পাত্তা না দিয়েই সিঙ্গুর প্যাকেজ ঘোষণা করে দিয়েছে। তাঁর ধর্না কর্মসূচির আগেও সিঙ্গুর যা ছিল এখনও তাই। টাটারাও আর কিছুদিনের মধ্যে সিঙ্গুরে ফিরে আসবে। অনিচ্ছুক চাষিদের যে দাবি তিনি তুলেছেন তাঁদের সরকারের ঘোষিত প্যাকেজ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থা আগের মতোই। তর্জন-গর্জন করা ছাড়া বিশেষ কিছু নয়।

অথচ ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসের কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে পড়বে কিনা জানিনা। এই সিঙ্গুর নিয়েই মমতা ধর্মতলায় অনশনে বসেছেন। তখনও তিনি এন ডি এর সঙ্গে নেই একথা বলেননি। অনশন মঞ্চে ছুটে এলেন বিজেপির সভাপতি রাজনাথ সিং। একবার, নয়, দু'দুবার। তারপর থেকেই জাতীয় রাজনীতিতে হই হই করে প্রচারে এল মমতার ধর্না কর্মসূচি। দেশ-বিদেশের সংবাদমাধ্যম অনশন সত্যাগ্রহ কভার করতে শুরু করল। দেশের অন্য দলের অনেক নেতা-নেত্রী ছুটে এলেন। লোকসভায় মমতা ছাড়া আর তৃণমূলের কোনও এমপি নেই। বিজেপিই সিঙ্গুর ইস্যু লোকসভায় তুলে জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছিল মমতাকে। প্রবল রাজনৈতিক চাপে বাধ্য হয়ে সে সময় বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য সরকার নতজানু হয়ে মমতার ধর্না তুলতে সক্রিয় হয়েছিল। আর এবার সিঙ্গুর নিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে এক ফোঁটাও চর্চা হল না। তৃণমূল নেত্রী এন ডি এ ছাড়ার কথা বললে বিজেপিও তাঁর আন্দোলনে মাথা ঘামায়নি। কেউ একবার ফিরেও তাকায়নি মমতার দিকে। উল্টে আন্দোলন করতে গিয়ে নিজেই চাপে পড়ে গিয়েছেন এবার। সংবাদ মাধ্যমের বড় অংশ তাঁর বিরুদ্ধে চলে গিয়েছে। কারণ, কেউই চায়নি প্রায় সম্পূর্ণ একটি কারখানা আবার বন্ধ হয়ে যাক। মমতা বুঝেছেন, পাশে কোনও জাতীয় দল না থাকলে কী অবস্থা হয়। পশ্চিমবঙ্গে তিনি যত শক্তিশালীই হোন না কেন দিল্লীতে কিছুমাত্র মর্যাদা পেতে তাঁর বিজেপিকে প্রয়োজন তা অন্তত সিঙ্গুর ধর্নার বার্তা। বিজেপি ছুঁয়ে না দেখলে রাজধানীতে তাঁকে কেউ পাত্তা দেবে না। অন্য লোকসভা ভোটের মুখে তাঁর এই জ্ঞানটুকু হওয়া উচিৎ।

## চীনা মোবাইল

*(১ পাতার পর)*

বলে গোয়েন্দা এবং ন্যাশন্যাল টেকনিক্যাল রিসার্চ অর্গানাইজেশনের বিশেষজ্ঞদের ধারণা। চীনা ছাড়া অন্যান্য মোবাইলে খুব সহজেই নেটওয়ার্ক পরিষেবা ও ব্যবহারকারীর অবস্থান চিহ্নিত করা যায়। এই ব্যবস্থায় মোবাইল চুরি হলে তা খুঁজে বের করতে সাহায্য করে। নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ফোন ব্লক করে দেওয়া যায়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বেশিরভাগ টেলিকম যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী চীনা সংস্থা হাউই-এর সাপ্লাই কিছুদিন আগে বন্ধ করে দিয়েছিল। কারণ সেই একই — নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা।

ভারতের ন্যাশন্যাল টেকনিক্যাল রিসার্চ অর্গানাইজেশন-এর সিনিয়র অফিসারদের মতে চীনা টেলিকম্ যন্ত্রাংশ সরবরাহকারী সংস্থাটির পক্ষে ভারতের সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা কর্তাদের ই-মেল ও ফোন ট্যাপ করাটাও অসম্ভব নয়। একথা জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক শীর্ষস্থানীয় অফিসার। এই সন্দেহে সম্প্রতি গোয়েন্দা কর্তারা গুরগাঁও ভিত্তিক হাউই কোম্পানীর বাঙ্গালোর স্থিত গবেষণা ও উন্নতকরণ কারখানা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। যদিও কোম্পানীর তরফে জানানো হয়েছে তাদের কাজকর্ম আইনানুমোদিত এবং আপত্তিকর কোনও কিছু সেখানে পাওয়া যায়নি।

## জঙ্গিদের বাড়বাড়ন্ত

*(১পাতার পর)*

দেয়। কিন্তু কোনও কিছুই শিবরাজের ঘুম ভাঙাতে পারেনি। কেন্দ্রীয় ইউ পি এ সরকারকে এর জন্য জনগণের কাছে জাবাবদিহি করতে হবে। আমেরিকার সঙ্গে পরমাণু চুক্তি নিয়ে মনমোহন সিংয়ের সরকার যতটা আগ্রহ দেখাচ্ছে তার মাত্র ১ শতাংশও যদি দেশের মানুষের নিরাপত্তার জন্য দেখাতো তবে জঙ্গিদের হামলায় এত অসংখ্য নিরপরাধ মানুষ অকালে প্রাণ হারাতেন না।

ইউ পি এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর জঙ্গিদের জেহাদি হামলা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর একমাত্র কারণ মুসলিম তোষণ নীতি। মনে রাখতে হবে যে ২০০৬-র ৭ মার্চ বেনারসে সঙ্কটমোচন মন্দিরে বোমা বিস্ফোরণে ২৮ জন নিহত হন। এরপর থেকেই অল্প সময়ের ব্যবধানে একের পর এক বোমা হামলায় ঘটনা ঘটেছে। যেমন, মুম্বাইতে শহরতলির ট্রেনে ১১ জুলাই, ২০০৬ বোমা বিস্ফোরণে ১৮৭ জন প্রাণ হারান এবং কমপক্ষে ৮০০ জন আহত হন। এরপর মালেগাঁওতে হামিদিয়া মসজিদে বোমা বিস্ফোরণে (সেপ্টেম্বর ৮, ২০০৬) ৩৭ জন মারা যান। আহত হন ১০০ জন। পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় সিনেমা হলে রাখা বোমায় (অক্টোবর ১৪, ২০০৬) ৬ জন নিহত ও ৩৮ জন গুরুতর আহত হন। এরপর ১৮ মে ও ২৫ আগস্ট, ২০০৭ সালে হায়দরাবাদে বিস্ফোরণে মোট ৫২ জন মারা যান। প্রশ্ন হচ্ছে, কেন জঙ্গিদের এতটা বাড়বাড়ন্ত ঘটলো। এর কারণ, ২০০৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে ইউ পি এ সরকার জঙ্গিদের প্রধান দলপতি নাসিরুদ্দিনকে নিঃশর্তে জেল থেকে ছেড়ে দেয়। এই নৃশংস জেহাদিকে একাধিক মানুষকে হত্যার অপরাধে আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিল। এরপর থেকেই জঙ্গিদের সাহস ও তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। মনে রাখতে হবে যে ইউ পি এ সরকারের শরিক ও বন্ধু লালুপ্রসাদ যাদব, রামবিলাস পাশোয়ান এবং মুলায়ম সিং যাদবরা এত কাণ্ডের পরেও বলছেন যে 'সিমি' একটি অহিংস জাতীয়তাবাদী সংগঠন। সিমি-র উপর থেকে সবরকম নিষেধাজ্ঞা তুলে দিয়ে তাদের খোলাখুলিভাবে কাজ করতে দেওয়া হোক। আমেদাবাদ, সুরাত থেকে দিল্লীর বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় সিমি জড়িত। তারপরেও যদি ইউ পি এ সরকারের শরিকরা সিমিকে ক্লিন চিট দেয় তবে বুঝতে হবে এই সরকারের হাতে দেশ নিরাপদ নয়।

## দিল্লীর নিষ্ক্রিয়তা সন্দেহজনক

*(১ পাতার পর)*

দিল্লী পুলিশ ওই ১২ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছিল স্বনামে-বেনামে বহু মুসলিম জঙ্গি দেশের বড় বড় শহরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটানোর ছক্ কষেছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন নাকি উত্তরপ্রদেশে ঘাঁটি গেঁড়ে রয়েছে। উদ্দেশ্য — সুযোগমতো রাজধানী দিল্লীতে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ ঘটানো। এও জানা যায় যে দিল্লী তাদের হামলার শীর্ষ তালিকায়ও রয়েছে। দিল্লী পুলিশ এও জানতে পারে যে মহম্মদ তাকির, যার আসল নাম আবদুস সুভান কুরেসি সেও সেখানে অপেক্ষা করছে। এই লোকটা হল ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন-এর জঙ্গি। প্রসঙ্গত, এবার দিল্লী বিস্ফোরণের দায় সিমির পাশাপাশি ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনও সোচ্চারে ঘোষণা করেছে। জানা গিয়েছিল, উল্লেখিত কুরেসি ছাড়াও আরও অন্তত দু'জন দিল্লীতে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের ই-মেল পেলেই তারা 'অ্যাকশন'-এ নেমে পড়বে।

কেবল দিল্লী পুলিশ নয়, প্রায় একই সময়ে হায়দরাবাদের একটি পুলিশ দলও আমেদাবাদ থেকে ঠিক একই খবর নিয়ে ফেরে অন্ধ্রপ্রদেশে। দুই পুলিশ দলের সূত্রে জানতে পারা যায় যে জঙ্গিদের এবার প্রথম ও প্রধান নিশানা ভারতের রাজধানী। কিন্তু ঘটনা হল তারপরও দিল্লী উত্তরপ্রদেশে ওইসব জঙ্গির সন্ধানে কার্যকর কোনও ভূমিকা নেয়নি। কেন?

সামনেই লোকসভা নির্বাচন। উত্তরপ্রদেশে সিমির পৃষ্ঠপোষক মুলায়ম সিং যাদব, যিনি সিমিকে নিষিদ্ধ রাখার বিরুদ্ধে লালু-পাশোয়ানের সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন, তাঁর দলের সঙ্গে ইউ পি-এর মুরুব্বি দল কংগ্রেসকে জোট করতে হবে বলে কি? এ প্রশ্নটাও দিল্লী বিস্ফোরণের পর রীতিমতো তুঙ্গে উঠেছে। বিশেষ করে একের পর এক বিস্ফোরণের পরেও স্বয়ং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিলের যে সব বক্তব্য বা বিবৃতির ফুলঝুরি ফুটতে দেখা যাচ্ছে তাতে খোদ তাঁর মতিগতি সম্পর্কেই জনমনে তীব্র সন্দেহের উদ্রেক হচ্ছে। প্রশ্ন উঠেছে আমেদাবাদ পুলিশের ধৃতদের কাছ থেকে দিল্লী সম্পর্কে এত নিখুঁত তথ্য পাওয়ার পরও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এইভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে রইল কেন?

দিল্লী পুলিশকে আমেদাবাদের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার আশীষ ভাটিয়া জানিয়েছিলেন যে বিস্ফোরণের জন্য তৈরি বোমাগুলির বিভিন্ন অংশ থাকে বিভিন্ন জায়গায় এবং বিভিন্ন লোকের কাছে। আসল মাথা যে সেই সময়মতো কোনও গুপ্ত জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটানোর কিছু আগে সেগুলো জুড়ে দেয়। ধৃত জঙ্গিরা নাকি তার নাম জানে না অথবা বলতে চায়নি। কিন্তু আমেদাবাদ পুলিশ তাদের কাছ থেকে এটুকু জানতে পারে যে সে দিল্লীর আশেপাশেই রয়েছে। অর্থাৎ খুব শীঘ্রই দিল্লীতে বিস্ফোরণ ঘটতে চলেছে একথা দিল্লী পুলিশ আমেদাবাদ থেকেই জেনে ফেরে।

শ্রী ভাটিয়ার কাছ থেকে দিল্লী পুলিশ এটা জেনে এসেছিল যে জয়পুর, আমেদাবাদ এবং হায়দরাবাদে যেভাবে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে দিল্লীতেও সেই একই কায়দায় হামলা চালানো হতে পারে। কারণ দিল্লীতে বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্যও নাকি একই লোক একসঙ্গে এইসব জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দিয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে উল্লেখিত তিন শহরের মতো দিল্লীতেও সাইকেলের বিয়ারিং, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ব্যবহার করা হয়েছে প্রচলিত বিস্ফোরক আর ডি এক্স-এর বদলে। হায়দরাবাদের গেকুল চকে এবং দিল্লীর লুম্বিনী পার্কে বিস্ফোরণের হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া গেছে। অর্থাৎ একই জেহাদীদের কাজ এটা। কিন্তু সব জেনেও প্রশাসনের নিষ্ক্রিয় থাকাটা অত্যন্ত সন্দেহজনক।


গহনা যদি গড়াতে চান যে
কোনও স্বর্ণকারকে

স্বপার

*ক্যাটলগ দেখাতে বলুন*

সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাক এণ্ড সন্স
১৫-ডি, গরাণ হাটা ষ্ট্রীট, কলি:-৬


### পূজা সংখ্যা ও বার্ষিক গ্রাহক

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ ৩১.১০.২০০৮ তারিখে বা তার আগেই শেষ হচ্ছে, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের গ্রাহক মেয়াদ নবীকরণের জন্য বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ২০০.০০ টাকা ২২.৯.২০০৮ তারিখের মধ্যে গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করে ডাকযোগে সরাসরি "Swastika" নামে ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট বা মনিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকা কার্যালয়ে পাঠান বা স্থানীয় প্রচার প্রতিনিধির কাছে জমা দেন।

টাকা জমা দেবার এক মাসের মধ্যে সবুজ পাকা রসিদ না পেলে স্থানীয় প্রচার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বা সরাসরি স্বস্তিকা কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

—*কার্যাধ্যক্ষ, স্বস্তিকা*

### এজেন্টদের প্রতি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা (১৪১৫)-র বিজ্ঞাপন গত কয়েক সপ্তাহ ধরে নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। আশা করি, আপনাদের তা নজরে এসেছে। যে সকল এজেন্ট এখনও তাঁদের প্রয়োজনীয় পূজা সংখ্যার অর্ডার দেননি, তাঁরা সত্বর কপি বুক করুন।

যথাসময়ে অর্ডার না পেলে নিয়মিত সংখ্যার মতো স্বস্তিকা পূজা সংখ্যাও পাঠানো হবে। অতিরিক্ত কপি পাঠানো সম্ভব হবে না।

আগস্ট ২০০৮ পর্যন্ত বিলের বকেয়া টাকা পূজা সংখ্যা পাঠানোর আগেই পরিশোধ করুন, যাতে পূজা সংখ্যা পাঠাতে আমরা অসুবিধায় না পড়ি।

—*কার্যাধ্যক্ষ, স্বস্তিকা*

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

# সম্পাদকীয়

## সন্ত্রাস ও ইউপিএ সরকার

গত চার মাসে দেশের চারটি প্রধান শহরে বিস্ফোরণ ঘটিয়া গেল। জয়পুর, ব্যাঙ্গালোর, আমেদাবাদ এবং দিল্লী। খোদ দেশের রাজধানী দিল্লীতে জনবহুল এলাকায় পরপর পাঁচটি বিস্ফোরণ আমাদের সুরক্ষা ব্যবস্থার গাফিলতিকে একেবারে নগ্নভাবে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে যে কার্যত কোনও কঠোর পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয় নাই, এই ঘটনায় তাহা আরও একবার উন্মোচিত হইয়াছে। অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার ক্ষেত্রে এইরকম নেতিবাচক মানসিকতা সন্ত্রাসবাদীদের দুঃসাহস আরও বাড়াইয়া দিয়াছে। যেভাবে দেশের প্রমুখ শহরগুলিতে বিস্ফোরণ ঘটাইবার পর খোদ রাজধানী দিল্লীকে নিশানা করা হইয়াছে তাহাতে মনে হইতেই পারে, রাজধানীর সুরক্ষা ভগবান ভরসাতেই চলিতেছে। যদি দিল্লীর নিরাপত্তার হাল এমন হয়, তাহা হইলে দেশের বাকি অংশের অবস্থা কেমন সহজেই অনুমেয়। এযাবৎ কেন্দ্র সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায় রাজ্যগুলির উপর চাপাইয়া দিয়া এড়াইয়া যাইতেন। কিন্তু খোদ দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের নাকের ডগায় যখন তাহা ঘটিল, বহু নিরীহ মানুষ নিহত ও আহত হইলেন, তখন কাহারও পক্ষেই আর সরকারের নিষ্ক্রিয়তা সম্পর্কে চুপ করিয়া থাকা সম্ভব নয়। দিল্লীতে আঘাত হানিয়া সন্ত্রাসবাদীরা শুধু তাহাদের দুঃসাহসের পরাকাষ্ঠাই প্রদর্শন করে নাই, শাসন পরিচালনায় ভারত সরকারের অপদার্থতাও প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। যদি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলি সামান্য সতর্ক থাকিত—যেমন তাহারা দাবি করিয়া থাকে, তাহা হইলে কি আগেই দেশের মানুষকে জানাইয়া সচেতন করিতে পারিত না? অবশ্য দিল্লীর সন্ত্রাসবাদী হামলার জন্য পুলিশকে দোষ দিয়া কোনও লাভ নাই। কেননা, তাহারা রাজনৈতিক প্রভুদের ইচ্ছানুযায়ীই কাজ করিতেছে। ইউপিএ আমলে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করিতে সরকার আদৌ ইচ্ছুক নয়। ফাঁসির আসামী মহম্মদ আফজল গুরুর শরীর স্বাস্থ্য এযাবৎ ভালোই রহিয়াছে। গুজরাট পুলিশ যে সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলায় সফল হইয়াছে তাহার কারণ সেই রাজ্যের রাজনৈতিক নেতৃত্ব কঠোর হস্তে সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলা করিতে বদ্ধ পরিকর। কেন্দ্রের এই দুর্বল সরকারের কাছ হইতে এইরূপ দৃঢ়তা দাবি বা আশা কোনওটাই করা যায় না।

এইসব দেখিয়া শুনিয়া সন্দেহ হয়, কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র দপ্তরে অযোগ্য লোকে ভর্তি হইয়া গিয়াছে। কেননা সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলা করিতে তাহারা রাজী নয়। শুধু তাই নয়, কথায় ও কাজে তাহারা এমন প্রচার করিতেছে যে সন্ত্রাসবাদ যেন তেমন কোনও সমস্যা নয়, তাই মোকাবিলার জন্য খুব কিছু করিবার প্রয়োজন নাই। আর এই কারণেই সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় গুজরাত, রাজস্থান, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ যেসব আইন প্রণয়ন করিয়াছে, কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র দপ্তর সেইসব আইনকে খারিজ করিয়া দিয়াছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলিয়াছেন, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় বর্তমান প্রচলিত আইনই যথেষ্ট—নতুন কোনও আইন তৈরির প্রয়োজন নাই। যদিও কংগ্রেস শাসিত মহারাষ্ট্রে এই ধরনের আইন চালু আছে। জাতীয় অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা লইয়াও পক্ষপাতিত্ব করিতে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার লজ্জা বোধ করে না। সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলা করিবার চেষ্টা করিলে তাহাদের মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কে টান পড়িবে—এই আশংকাই স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এমন অযৌক্তিক ও রাষ্ট্রবিরোধী নীতি। বিশ্বে বোধ হয় ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে নিজেদের ভোট ব্যাঙ্ক অটুট রাখিতে শুধু রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা নয়, জাতীয় অস্মিতা বা পরিচিতি বিসর্জন দিতেও সেকুলারবাদীরা সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলি দ্বিধা করে না। এই দেশের শাসকদলের অনেক নেতা মন্ত্রী এবং রাজনীতিকরা 'সিমি'-কে 'ক্লিন চিট' দিতে দ্বিধা করে নাই, যখন দেশের সর্বোচ্চ আদালত সিমি-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে এবং জয়পুর, আমেদাবাদ ও ব্যাঙ্গালোরে বিস্ফোরণের জন্য দায়ী বলিয়া মনে করা হইতেছে। যদি শাসক বর্গ দেশের মানুষের মনোবল আরও ভাঙিতে না চাহেন, তবে নিহতদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের পরিবর্তে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় দৃঢ় কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।

দিল্লীতে এইরকম বিস্ফোরণ যে ঘটিতে পারে — গোয়েন্দা এজেন্সীগুলির কাছে এই খবর তো ছিলই। আমেদাবাদে ২৬ জুলাই সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে জড়িত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদের সূত্রে সন্ত্রাসবাদীদের দিল্লীতে হামলার যে ছকের কথা জানা গিয়াছিল, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাহা আগেই কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাইয়া দিয়াছিলেন। এতদসত্ত্বেও যে সন্ত্রাসীরা আঘাত হানিল, তাহার প্রাথমিক কারণ, দেশের মানুষের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করিবার দায়িত্ব কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার উপেক্ষা করিয়াছে। দেশের প্রধানমন্ত্রী হয় আমেরিকার সঙ্গে পারমাণবিক চুক্তি লইয়া ব্যস্ত, নয়তো তিনি সন্ত্রাসবাদী এবং তাহাদের পরিবার-পরিজনদের দুরবস্থা লইয়া উদ্বিগ্ন। এরপর যদিও বা কিছু সময় থাকে তবে ইসলামি মৌলবাদীদের আরও কিভাবে মদত দেওয়া যাইতে পারে সেই পরিকল্পনায় চিন্তাগ্রস্ত। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নিজের পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি যতটা নজর অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রাখিবার মতো ততটা নাই, নয়তো রুচি নাই। সমালোচকেরা অবশ্য বলিয়া থাকেন, স্বরাষ্ট্র দপ্তর সামলাইবার মতো তাঁহার কোনও যোগ্যতাই নাই। সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে এই নিষ্ক্রিয়তা দলের মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ককে স্ফীত করিবে বলিয়া কংগ্রেস হয়তো বিশ্বাস করে। সন্ত্রাসবাদীদের এই হামলা চলিতে দেওয়ায় ইউপিএ সরকারের ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্যতা হয়তো আরও বাড়িবে বলিয়াই তাহারা মনে করে। সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণের যাহারা শিকার হইতেছেন, তাহাদের প্রতি কোনও দায়বদ্ধতা প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং, ইউ পি এ সরকারের আছে বলিয়া বোধ হয় না। তাই প্রধানমন্ত্রীর শান্তি রক্ষার আহ্বান, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অসংলগ্ন, গতানুগতিক কথাবার্তা, ভারতের শত্রুদের প্রতি নিয়মমাফিক নিন্দা—এইসব শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বর শুনিয়া ঘৃণা করিতে ইচ্ছা হয়, কেননা ইহাই তাহাদের জন্য উপযুক্ত।

# অস্ট্রেলিয়ায় যা ঘটেছে তার থেকে আমরা কি শিক্ষা নিতে পারি?

**তথাগত রায়**

বাকি পৃথিবীর মতো অস্ট্রেলিয়াতেও ইসলামী মৌলবাদীরা নাশকতামূলক ঘটনা ঘটিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া সম্বন্ধে আমরা অনেকেই ক্রিকেট ছাড়া আর বিশেষ কিছু জানি না। অস্ট্রেলিয়া একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ দেশ, ইউরোপের বেশিরভাগ উন্নত দেশের তুল্য। এই দেশের আদিম অধিবাসীরা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের বাকি অধিবাসীদের মতোই। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ইংল্যান্ড থেকে আগত শ্বেতাঙ্গরা এখানে বসতি স্থাপন করতে আরম্ভ করে। এবং আদিম অধিবাসীদের উপর খুব অত্যাচারও করে। পরে এই দেশ শুধু শ্বেতাঙ্গদের প্রবেশাধিকার দিত। কিন্তু গত পঞ্চাশ বছরে পরিস্থিতি অনেক বদলেছে, এবং বহু চীনা, জাপানী, আরব ও ভারতীয় অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে এবং সুখেই আছে।

এই গত পঞ্চাশ বছরে যারা অস্ট্রেলিয়ায় বসতি করেছে তাদের একটা অংশ মুসলিম। এবং বলা যায় অবধারিতভাবেই, তাদের একটা অংশ মৌলবাদী। ইদানীং এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত মুসলিম ডাক্তারকে ভুল করে অস্ট্রেলিয়ার পুলিশ গ্রেপ্তার করার ফলে খুব হৈ চৈ হয়েছিল, আমাদের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছিলেন, ওই ডাক্তারের দুঃখে তিনি রাতে ঘুমোতে পারেননি। উল্লেখ্য, মুসলিম উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপের ফলে মুম্বইতে ট্রেন বিস্ফোরণে যে আড়াইশো লোক মারা গেলেন তারা কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারেননি। সে যাই হোক, এই মুসলিম মৌলবাদীরা (যারা আদৌ সমস্ত মুসলিমের প্রতিনিধিত্ব করে না) ইদানীং নানারকম দাবি করতে আরম্ভ করেছে।

কি এই দাবি? না, তাদের শরিয়ত মেনে চলবার স্বাধীনতা দিতে হবে। অর্থাৎ, তাদের ক্ষেত্রে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন বলবৎ করতে হবে — তথাকথিত 'সেকুলার' ভারতে যেমন আছে! অর্থাৎ তাদের পুরুষদের চারটি বিয়ে করবার স্বাধীনতা দিতে হবে, মেয়েদের শস্যক্ষেত্র হিসেবে, যেখানে পুরুষ যখন খুশি যেতে পারে, দেখবার অধিকার দিতে হবে, একতরফাভাবে কারুর স্ত্রীকে তালাক দেবার অধিকার দিতে হবে, ইংরাজির বদলে আরবী ভাষা পড়বার স্বাধীনতা দিতে হবে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই সব দাবির প্রতি অস্ট্রেলিয়ান সরকার আদৌ কান দেয়নি। তার প্রতিশোধস্বরূপই হোক, বা অন্য কোনও কারণেই হোক মুসলিম মৌলবাদী উগ্রপন্থীরা একটা বিস্ফোরণ ঘটায়। বিস্ফোরণটি হয় ২০০২ সালের ১২ অক্টোবর, ইন্দোনেশিয়ার বালিদ্বীপে (এটি হিন্দুপ্রধান দ্বীপ)। বিস্ফোরণের বলি ২০২ জন, যার মধ্যে ১৬৪ জন অস্ট্রেলিয়ান পর্যটক, ৩৮ জন স্থানীয় মানুষ। জেমাহ্ ইসলামিয়া নামক একটি ইন্দোনেশিয় উগ্রপন্থী প্রতিষ্ঠান এই বিস্ফোরণের দায়িত্ব স্বীকার করে।

এরপরে অস্ট্রেলিয়ায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড জনমতের হাওয়া ওঠে, নাশকতার চেষ্টা হয়, দু-একটি ধ্বংসাত্মক ঘটনাও ঘটে, যদিও হতাহত কেউ হয়নি। তারপর অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী জন হাওয়ার্ড দেশের মুসলিমদের উদ্দেশে একটি বিবৃতি দেন। এই বিবৃতিটি এত স্পষ্ট বুদ্ধির ও পরিষ্কার চিন্তার ইঙ্গিতবাহী যে এটিকে বাংলা ভাষান্তর করে পুরোপুরি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এই বিবৃতিটি ভারতের প্রতি কতটা প্রযোজ্য সেটাও আলোচনা করা হয়েছে।

নাশকতামূলক ঘটনা ঘটার পর থেকে অস্ট্রেলিয়ার মুসলিমদের একটা নালিশ ছিল যে তাদের মসজিদে মসজিদে যা আলোচনা হয় দেশের গুপ্তচর সংস্থা তার খবর রাখছে। হাওয়ার্ড এর উত্তরে বললেন, "ঠিকই করছে।" এছাড়া যে বিবৃতিটি দিলেন সেটি নিম্নরূপঃ

"যাঁরা বাইরে থেকে এসেছেন তাঁদেরই মানিয়ে নিতে হবে।

অস্ট্রেলিয়ানরা মানিয়ে নেবেন না।

পছন্দ না হলে অন্যত্র চলে যান।

বহুদিন ধরে নালিশ শুনতে শুনতে পরিশ্রান্ত হয়ে গেছি যে আমরা নাকি কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা তাঁদের সংস্কৃতিকে আঘাত করছি।" বালিদ্বীপে বিস্ফোরণের ঘটনার পরে আমরা অস্ট্রেলিয়ানদের মধ্যে এক দেশপ্রেমের জোয়ারও দেখেছি। এই প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাই।

আমাদের দেশের সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে দুই শতাব্দী ধরে বহু মানুষের সংগ্রামের ফলে, যাঁরা স্বাধীনতার খোঁজে এদেশে এসেছিলেন।

আমরা ইংরাজি বলি। স্প্যানিশ, লেবানীজ, আরবী, চীনা, জাপানী, রাশিয়ান বা অন্য কোনও ভাষা বলি না। অতএব আমাদের সমাজে অন্তর্ভুক্ত হতে হলে ইংরাজি শিখতে হবে।

বেশিরভাগ অস্ট্রেলিয়ান ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। এটা কোনও খৃস্টান বা দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক মত নয়, ঘটনা। তার কারণ, খৃস্টান পুরুষ ও নারীরা খৃস্টান ধর্মের ভিত্তিতে এই জাতিকে সৃষ্টি করেছিলেন। আমাদের দেশে স্কুলের দেওয়ালে এই কথা লেখা থাকে, এতে বিন্দুমাত্র দোষ নেই। যদি ঈশ্বরের নাম করলে কারুর পছন্দ না হয় তবে অন্যত্র চলে যাওয়াই ভাল, কারণ ঈশ্বর আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ।

অন্য ধর্মমতকে আমরা শ্রদ্ধা করব, তাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলব না। আমার অনুরোধ শুধু এই আমাদের ধর্মমতকেও শ্রদ্ধা করুন, আমাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এবং শান্তিতে বসবাস করুন।

এটা আমাদের দেশ, আমাদের মাটি, আমাদের জীবনধারা। আপনারা (নবাগতরা) সবরকমভাবে একে উপভোগ করুন, আমরা তাই চাই। কিন্তু এই নিয়ে যদি নালিশই করতে থাকেন তাহলে আপনাদের মনে করিয়ে দেব যে অস্ট্রেলিয়াতে আর একটি বিশেষ স্বাধীনতা আছে। তা হল, দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাবার স্বাধীনতা।

আপনাদের যদি এই দেশের জীবনধারা ভাল না লাগে তাহলে যেখানে খুশি চলে যান। আমরা আপনাদের এখানে ডাকিনি। আপনারাই এসেছেন। তাই যে দেশকে আপনারা নিজের মনে করেছেন তার জীবনধারাকেও নিজের মনে করে নিন।"

এর থেকে ভারতের কি শিক্ষা নেবার আছে?

এই প্রসঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা পূর্ব ইতিহাস একটু ভাবতে হবে। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি সময় নাগাদ ভারতের রাজনীতি পুরোপুরিভাবে ধর্মের ভিত্তিতে মেরুকৃত (polarized) হয়ে গিয়েছিল। তিন প্রধান ধর্মসম্প্রদায় — হিন্দুরা পুরোপুরি কংগ্রেসের সপক্ষে, মুসলিমরা পুরোপুরি মুসলিম লীগের সপক্ষে এবং শিখরা পুরোপুরি অকালী দলের সপক্ষে ছিল। এরমধ্যে কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ দল হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমদের সমর্থন আদৌ পায়নি — মৌলানা আজাদ প্রমুখ যে কজন মুসলিম কংগ্রেসে ছিলেন তাঁদের হাতে গোণা যায়। হিন্দুরাষ্ট্র সমর্থক হিন্দু মহাসভা হিন্দুদের মধ্যে থেকে অল্পই সমর্থন পেয়েছিল। অপরপক্ষে চরম সাম্প্রদায়িক, উগ্রপন্থী, হিন্দুবিরোধী মুসলিম লীগের পিছনে মুসলিম জনসাধারণের সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল (ভিনসেন্ট স্মিথ ও পার্সিভাল স্পীয়ারকৃত 'দি অক্সফোর্ড হিস্টরি অফ ইন্ডিয়া' দ্রষ্টব্য, ৪র্থ সংখ্যা, পৃঃ ৮৩১)। ধর্মনিরপেক্ষতার সামান্য ছিটেফোঁটা বিশিষ্ট যে সমস্ত মুসলিম দল ছিল, যেমন বাংলার কৃষক প্রজা পার্টি পঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট পার্টি, তারা সবাই এই সময় আস্তে আস্তে উঠে গেল এবং তাদের নেতারা মুসলিম লীগে যোগ দিল। ১৯৪০ সালেই মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবি করেছিল। দিনে দিনে সে দাবি আরও জোরদার হয়েছিল, এই দাবির সমর্থনেই মুসলিম লীগ কলকাতার কুখ্যাত দাঙ্গা এবং নোয়াখালির হিন্দু হত্যা করিয়েছিল। অর্থাৎ এতে কোনও সন্দেহ নেই

(এরপর ৪ পাতায়)

> “আপনাদের যদি এই দেশের জীবনধারা ভাল না লাগে তাহলে যেখানে খুশি চলে যান। আমরা আপনাদের এখানে ডাকিনি। আপনারাই এসেছেন। তাই যে দেশকে আপনারা নিজের মনে করেছেন তার জীবনধারাকেও নিজের মনে করে নিন।”

## এই সময়

### ধূর্ত পাক

উপরে উপরে রাজনৈতিক বোঝাপড়া থাকলেও কূটনৈতিক স্তরে আমেরিকাকে কোনওরকম সুযোগ সুবিধা দিতে নারাজ পাকিস্তানী সেনাবাহিনী। গোপন সূত্র অনুযায়ী, সম্প্রতি এক পাকিস্তানী কমান্ডার নির্দেশ দিয়েছেন, আল কায়েদা ও তালিবানদের খুঁজতে এসে যদি মার্কিনী গোয়েন্দারা কোনওরকম বাড়াবাড়ি করে তাহলে তাদের জবাই করতে যেন কসুর না করে পাক গোয়েন্দারা। আন্তর্জাতিক মহলের সূত্র অনুযায়ী, পাক সেনা কমান্ডারের এমন নির্দেশ নাকি আল-কায়েদা, তালিবানদেরই পরোক্ষে রক্ষার পরিকল্পনা বলে মনে করছে হোয়াইট হাউস।

### পাতিল বাতিল হোক

গত ১৩ সেপ্টেম্বর দিল্লীতে বিস্ফোরণের ঘটনায় এবার সাধারণ মানুষই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাতিলকে অভিযোগের কাঠগড়ায় দাঁড় করাল। গত চার বছর ধরে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে ক্ষমতায় অসীন থাকলেও দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিস্ফোরণ আটকাতে কোনও কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেননি। এজন্য দেশের ৯৪ শতাংশ মানুষের মতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরপদ থেকে তাঁর ইস্তফা দেওয়া উচিত। গত ১৪ সেপ্টেম্বর একটি বেসরকারি সংবাদ মাধ্যমের সমীক্ষায় এই তথ্য উঠে এসেছে।

### তলে তলে

দিল্লী বিস্ফোরণের তদন্ত করতে গিয়ে এক নতুন ধরনের তথ্য উঠে এল মুম্বই পুলিশের তদন্তকারী দলের কাছে। গত ১৩ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে ইন্টারনেটের বিভিন্ন তথ্য ঘাঁটতে গিয়ে তারা ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন তথা সিমির ই-মেলের মাধ্যমে সিরিয়াল বিস্ফোরণের তথ্য পায়। সেই তথ্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানতে পারে, গত এক দশকের মধ্যে গঠিত বহু ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, পরামর্শদানকারী সংস্থা, সেবাদানকারী সংস্থা গঠিত হয়েছে যারা সরাসরি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আল কায়েদার মতো কুখ্যাত জঙ্গিদের সহায়তার জন্য কাজ করে চলেছে।

### ক্রীতদাস প্রথা

আজও সব্জি বিক্রির মতো বাচ্চাদের বিক্রি করার কারবার চলছে রমরমিয়ে। শুনতে অবাক লাগলেও ঘটনাটি চীন দেশের। চীনের সংবাদপত্রে প্রকাশ, সেখানকার ১৩ থেকে ১৪ বছর বয়সী বালকদের দেশেরই বিভিন্ন প্রান্তে গোপনে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি সুয়ান প্রান্তে এই ব্যবসা বেশি বলে জানা গেছে। বিক্রি হয়ে যাওয়া বালকদের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। সামান্য টাকার বিনিময়ে তাদেরকে দিয়ে বেশি করে খাটানো হয়।

### শক্তের ভক্ত.........

নেপালের রাজপরিবারের প্রতি কমিউনিস্ট তথা মাওবাদীরা তত্ত্বগতভাবে বিরোধিতা করলেও আরবের রাজশক্তির বিরুদ্ধে কিন্তু একেবারেই চুপচাপ। সম্প্রতি ফোবর্স ম্যাগাজিনের এক সমীক্ষায় বিশ্বের প্রথম সারির ধন-সম্পদে সমৃদ্ধ রাজাদের মধ্যে আরবের রাজাদেরই প্রভাব প্রতিপত্তির কথা প্রকাশ করা হলেও মাওবাদী নেতা প্রচন্ড সহ বিশ্বের সমস্ত বামপন্থীরা চুপচাপ। অথচ নেপালের রাজশক্তির বিরুদ্ধে জঙ্গিহানাকে সব বামপন্থী নেতাই সমর্থন করেছিলেন কমিউনিজমের তত্ত্ব তুলে ধরে। আরবের ক্ষেত্রে মাওবাদীরা তো বটেই, বামপন্থীরাও কিন্তু টু শব্দটি করতে নারাজ।

### ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটি

ক্যালকাটা মেথামেটিক্যাল সোসাইটি শতবর্ষ পূর্ণ করলেও আজও আর্থিক এবং পরিকাঠামোর দিক থেকে দৈন্য দশায় রয়েছে। এশিয়ার প্রাচীন এই সমিতি স্যার আশুতোষ মুখার্জ্জি কর্তৃক ১৯০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এই সংস্থাটির উন্নতির স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু ১০০ বছর পূর্ণ হলেও তেমন কোনও উন্নতি হয়নি। লাইব্রেরি থাকলেও ১০ জনের বেশি সেখানে কেউ বসতে পারেন না। স্টাফ নিয়োজিত থাকলেও তারা সরকারিভাবে স্বীকৃত নয়। কেন্দ্র ও রাজ্য কোনও সরকারই এর উন্নতির প্রতি কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। অথচ বিশ্বের দরবারেও ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটির সুখ্যাতি রয়েছে।

### সর্বনাশা প্লাস্টিক

প্লাস্টিক বোতলের ব্যবহার মস্তিষ্কের পক্ষে ক্ষতিকর বলে জানালেন গবেষকরা। সম্প্রতি কানাডার বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষামূলকভাবে এই তথ্য প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে প্লাস্টিক বোতল তথা জিনিসপত্র তৈরির সময় বিসফেনোল এ (বিপিএ) -ক্যামিকেল ব্যবহার করা হয়। এই ক্যামিকেলটি মানুষের স্মৃতিভ্রম ও মেধাশক্তি হ্রাস করে। শুধু তাই নয়, বি পি এ-র প্রভাবে অ্যালার্জি ও স্ফিটসোফ্রীনিয়াতে আক্রান্ত হবারও সম্ভবনা থাকে।

# অস্ট্রেলিয়া থেকে শিক্ষা নিতে পারি ?

*(৩ পাতার পর)*

যে স্বাধীনতার ঠিক-পূর্বে দেশের নিরানববই দশমিক নয় শতাংশ মুসলিমই পাকিস্তানের পক্ষে ছিল।

তারপর, যখন ১৯৪৭ সালের ৩ জুন দেশভাগ ঘোষিত হল তখন দেশের প্রতি মুসলিদের সামনে একটা বেছে নেবার সুযোগ এসেছিল — তারা ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে থাকবে, না ইসলামী পাকিস্তানে যাবে? লক্ষণীয়, এই সুযোগ কিন্তু হিন্দু, শিখ, খৃস্টান, বৌদ্ধ বা অন্য কোনও ধর্মসম্প্রদায়ের সামনে ছিল না। ইসলামী পাকিস্তান থেকে হিন্দু-শিখ-খৃস্টান-বৌদ্ধ সবাই কালক্রমে বিতাড়িত হয়েছিল। যে পশ্চিম পাকিস্তান ভূ-খন্ডে ১৯৪১ সালে ১৯ শতাংশ হিন্দু-শিখ ছিল ১৯৫১ সালে তাদের সংখ্যা নেমে এসেছিল ১ শতাংশ-তে, যে পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) ভূখন্ডে ১৯৪১ সালে ২৯ শতাংশ হিন্দু বৌদ্ধ খৃস্টান ছিল তাদের সংখ্যা ২০০১ সালে এসে দাঁড়িয়েছে। ৯ শতাংশ তে।

এই অবস্থায়, দেখা গেছে দুতরফা দাঙ্গার ফলে পূর্ব-পাঞ্জাবের সব মুসলিমই পাকিস্তান চলে যায়। এছাড়া উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বিহার থেকে বিরাট মুসলিম জনগোষ্ঠী পাকিস্তান চলে যায় — এদের বর্তমান পাকিস্তানে 'মোহাজির' বলা হয়। কিন্তু পূর্ব-বাংলায় একতরফা হিন্দুর উপর অত্যাচার হয়েছিল — পশ্চিমবাংলায় অনুরূপ মুসলিম-বিরোধী কোনও ঘটনা ঘটেনি বলে পশ্চিমবাংলা থেকে সামান্য কিছু উচ্চবিত্ত, সরকারি চাকুরে ও পেশাজীবী ছাড়া, মুসলমানরা বড় সংখ্যায় চলে যায়নি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই বেছে নেবার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যখন এত মুসলিম ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে থেকে গেল তখন কি তাদের উচিত নয়, ভারতের সংস্কৃতিকে, ভারতের পরম্পরাকে (যার মধ্যে রাম-লক্ষ্মণ, সম্রাট-অশোক-সমুদ্রগুপ্ত থেকে আরম্ভ করে সম্রাট অকবর পর্যন্ত সবাই আছেন) মেনে নেওয়া? তাদের কি উচিত নয়, সব মানুষের জন্য এক ব্যক্তিগত আইন মেনে নেওয়া, সংবিধানের ৪৪ নং অনুচ্ছেদে যার বিধান আছে? উল্লেখ্য, সব মানুষের জন্য এক ফৌজদারী আইন সবাই মেনে নিয়েছে — এখানে হিন্দু চোর এবং মুসলিম চোর, দুজনেরই তিন বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড হতে পারে, শরিয়ত অনুযায়ী মুসলিম-চোরের হাত কেটে দেবার প্রশ্ন ওঠে না।

অতএব বক্তব্য, মুসলিমরা যাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে থাকবেন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন তাঁদের মানসিকতা বদলাতে হবে। তসলিমা নাসরিন শুধু কিছু বই লিখেছেন বলে তাঁকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া চলবে না, মুখে চুনকালি মাখানোর ফতোয়া দেওয়াও চলবে না। স্বঘোষিত "মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড" বাতিল করতে হবে। আইন — সে ব্যক্তিগত আইনই হোক আর ফৌজদারী আইনই হোক — সকলের জন্য এক হতেই হবে। তা না হলে ধর্মনিরপেক্ষতা, সেকুলারিজম্ (যার প্রকৃত অর্থ ধর্মহীনতা) কথাগুলো নিরর্থক হয়ে যাবে, ভারতও পাকিস্তানের মতো ধর্মাশ্রিত দেশ হয়ে যাবে।

**পাত্র চাই**

পঃবঃ মহিষ্য, সম্ভ্রান্ত পরিবারের একমাত্র সন্তান ২৭ ৭ ৫ক্স৪ক্ট ফর্সা, সঙ্গীতজ্ঞা, MBS ৩৩ + মধ্যে উচ্চশিক্ষিত পাত্র চাই।

**যোগাযোগ ঃ- সমীরণ রায়**

৯৪৩৪৫৬৯৩৪৩, ৯৮৫১৯১২৬৯৭

**বিশেষ ঘোষণা**

বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব 'দুর্গাপূজা' উপলক্ষ্যে জাতীয়তাবাদী ও হিন্দুচেতনা জাগ্রতকারী বইয়ের স্টল করতে শীঘ্র যোগাযোগ করুন।

সদ্য প্রকাশিত

**বাঙালীর পরিত্রাতা শ্যামাপ্রসাদ**

মূল্য-৫০ (বোর্ড বাধাই), সাধারণ - ৪০ টাকা

**নিয়মাবলী**

◆ ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে যোগাযোগ করতে হবে। ◆ টাকা জমা দিয়েই বই নিতে হবে ◆ অবিক্রিত বই ফেরত নেওয়া হবে ◆ বেশি পরিমাণ বইয়ের ক্ষেত্রে আলোচনা সাপেক্ষে আকর্ষণীয় কমিশনের ব্যবস্থা আছে

**বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র, ৬, বঙ্কিম চাট্যার্জী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩**

✆ ৯৩৩৯৪৯৯৫৯৫

# ফ্রন্টে দ্বন্দ্ব ঃ সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম সিপিএমের মৃত্যুবাণ না হয়

নিশাকর সোম

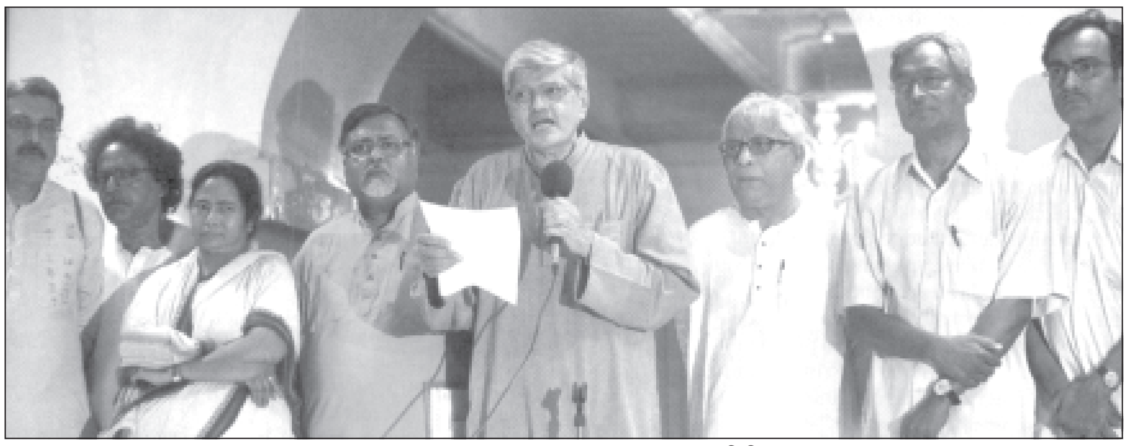

রাজ্যপালের সঙ্গে মমতা এবং বুদ্ধদেববাবু সহ তৃণমূল ও সিপিএম নেতৃবৃন্দ।

সিঙ্গুরে টাটা প্রকল্প নিয়ে অনেক জল ঘোলা হওয়ার পর রাজ্যপালের মধ্যস্থতায় তিনদিনের আলোচনার শেষে সরকার এবং বিরোধীদল টি এম সি-এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগে বহু নাটকীয় ঘটনা ঘটে — (১) রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন টাটা প্রকল্পের এক

রাজ্য রাজনীতি

ইঞ্চি ও জমি ছাড়তে রাজি হননি। (২) তখন রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে আলোচনার জন্য ডেকে পাঠান। (৩) মুখ্যমন্ত্রী তিনবার রাজভবনে আসেন। (৪) মমতা ব্যানার্জিও আসেন। (৫) মমতা ও মুখ্যমন্ত্রী মুখোমুখি আলোচনা করেন। শোনা যাচ্ছে, মমতা ব্যানার্জি নাকি নিরুপম সেন-কে দেখিয়ে বলেন, "এই লোকটাকে এনেছেন কেন? ইনি আপনাকে কোনও কাজ করতে দিচ্ছেন না।" যা-হোক, দু'পক্ষের সমঝোতার পর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বলাই বাহুল্য, সিঙ্গুর নিয়ে যা হল — তার জন্য পুরোপুরি দায়ী বুদ্ধ দেব, নিরুপম। বুদ্ধ দেববাবু জনসভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "ওরা ৩০ জন আমরা ২৩৫ জন। ওরা সভা করলে আমরা সভা করবো। ওরা মিছিল করলে আমরাও মিছিল করবো। দেখি কি হয়।" তিনি আরও বলেন, "আমি আমাদের লোকদের বলে দিয়েছি, মার খেয়ে ফিরে আসা চলবে না।"

আরও বিশদে বিশ্লেষণে যাবার আগে দেখা দরকার সিঙ্গুরে আন্দোলনের মূল বিষয়টা কী? জমি হারানোর আতঙ্কে জমি আছে এমন কৃষকরা প্রথমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলন শুরু করেন। পরে মমতা ব্যানার্জি এবং তাঁর সঙ্গী দলবল ধর্মতলা ছেড়ে সিঙ্গুরে চলে আসেন। মমতা-কে নকশাল, এস ইউ সি, পি ডি এস এবং ইমামও সমর্থন করতে আসেন। এঁরা প্রত্যেকেই লাভ তুলতে আসেন। এক কথায় নিজেদের পায়ের তলার মাটির সন্ধানে আসেন। সিঙ্গুর আন্দোলনের অবস্থা দেখে বুদ্ধ বাবু ঘাবড়ে যান। তিনি বারংবার আলোচনার জন্য বিরোধী নেত্রীকে আহ্বান জানাতে থাকেন। এই সময় রাজ্যপাল আলোচনায় আসার জন্য মমতাকে পত্র দেন। মমতা রাজ্যপালের মধ্যস্থতায় রাজি হন এবং তখনই বুদ্ধ দেববাবুরাও আলোচনায় রাজ্যপালের মধ্যস্থতা মেনে নেন।

এখানে স্মরণ করা যায়, সি পি এম নেতা (বিনয় কোঙার) রাজ্যপাল সম্বন্ধে বলেছিলেন, "রাজ্যপাল তৃণমূলের পতাকা নিয়ে রাজনীতি করুন।" রাজ্যপালকে নিয়ে সিপিএম-এর পার্টি কংগ্রেস এবং কেন্দ্রীয় কমিটিতে বহু বিরূপ সমালোচনা হয়। তথাপি এই রাজ্যপালকে মধ্যস্থ মেনে নিয়ে সিপিএম মাথা নত করে আলোচনায় এলো। রাজ্যপাল সম্পর্কে ডিগবাজী খেয়ে সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদক তথা পলিটব্যুরো সদস্য বিমান বসু ভূয়সী প্রশংসা করেন। এখানেই শেষ নয়, বিমান বসু মমতা ব্যানার্জি-রও প্রশংসা করেছেন। ধন্য সিপিএম। তাদের নীতি হল — কিক অ্যান্ড কিস। কভু কাঁধে হাত কভু অর্ধচাঁদ। এই রাজনীতি বড়ই জটিল এবং কুটিল।

সিঙ্গুরের আলোচনা-কে কেন্দ্র করে সিপিএম-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে আলোচনায় দুটি ভাগ দেখা যায় — একদিকে নিরুপম সেনের নেতৃত্বে বর্ধমান লবি বিনয় কোঙার ও মদন ঘোষ। অপরদিকে বুদ্ধ বাবুর পক্ষে সূর্যকান্ত মিশ্র। সুভাষ চক্রবর্তী নাকি মমতার বিরুদ্ধেই বলেছিলেন — তাঁর বক্তব্য ছিল জোর করে ধর্ণা তুলে দেওয়া হোক। গৌতম দেব বলেছিলেন শিল্পায়নের মূল লক্ষ্য ঠিক রেখে আলোচনা হোক। বুদ্ধ বাবু যেনতেন প্রকারেণ মীমাংসা চাইছিলেন। আর নিরুপমবাবু খালি বলেছিলেন, টাটারা চলে যাবে। শেষমেশ বুদ্ধ বাবু এবং মমতা ব্যানার্জি-র আলোচনার ফল হিসাবে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাতে স্বাক্ষর করেন শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন। নিরুপম সেন এই চুক্তি স্বাক্ষর করতে চাননি। তিনি হাত নেড়ে বুদ্ধ বাবু-কে বেরিয়ে আসতে বলেছিলেন। বুদ্ধ বাবুর তখন অবস্থা "ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।" এই চুক্তি স্বাক্ষর করার আগে সি পি এম-এর রাজ্য দপ্তরে উপস্থিত রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের অধিকাংশই জমি না ছাড়ার দাবিতে অনড় থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, মমতা ধর্ণা বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারবেন না। কাজেই চুক্তির পর মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধ দেববাবুর বিরুদ্ধে নিরুপম তোপ দাগলেন এবং তাঁকে পূর্ণ সমর্থন জানালেন বিনয় কোঙার ও মদন ঘোষ। সূর্যকান্তবাবুর বক্তব্য হল, তিনজনে গেলাম — একজনই সব সিদ্ধান্ত নিলেন কেন? সিপিএম-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর কোনও কোনও সদস্য বলেছিলেন, সর্বদলীয় সভা ডেকে সিঙ্গুর সমস্যা আলোচনা করা দরকার।

চুক্তির পর নিরুপমবাবু এবং বুদ্ধ বাবুর মধ্যে এই টানাটানি দেখে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অশোক ঘোষ বলেছেন, এই চুক্তির মধ্যে স্বচ্ছতার অভাব আছে। কেউ কেউ বলছেন, এই চুক্তির একাংশ গোপন করা হচ্ছে। এ সমস্ত কথার ভয়ে এবং পার্টির মধ্যে দ্বন্দ্ব হওয়াতে বামফ্রন্টের সভা ডেকেও স্থগিত করলেন বিমান বসু। সিঙ্গুর ইস্যু নিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে আক্রান্ত হবেন বুদ্ধ-নিরুপম। নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর চুক্তি-কে কেন্দ্র করে রাজ্য সিপিএম-এ দলাদলি তীব্র হয়েছে। নীচের তলাতে পার্টি নেতাদের ঔদ্ধত্য এবং পরবর্তী সময়ে মমতা-র কাছে আত্মসমর্পণকে তীব্র সমালোচনা করা হচ্ছে। পার্টির একাংশ মনে করেন, সিঙ্গুর চুক্তি সিপিএম-এর পরাজয়। তাঁরা আরও মনে করেন, নকশাল, এস ইউ সি-সিপি এম- এর রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করবে।

(এরপর ১০ পাতায়)

অ ফে রকম

# ঊষার আলো

**নিজস্ব প্রতিনিধি** ।। সবাই তো তাকে দেখে বেবাক তাজ্জব। কী রে বাবা! মেয়েটা কি পরীক্ষা দিতে এসেছে নাকি বিয়ের রেজিস্ট্রিপত্রে সই করবে বলে কনের সাজে এসেছে! চড়ক ভাঙতে অবশ্য সময় লাগেনি। কনে সাজা মেয়েটা সত্যি সত্যি পরীক্ষাই দিতে এসেছে।

হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা বলে কথা! তার ওপর পড়াশুনোর ব্যাপারে গোড়াগুড়িই আগ্রহী রাজস্থানের উদয়পুরের এক মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে ঊষা। পরীক্ষার ব্যাপারে যেকোনও সময়ই তার দৃঢ়তা সবাইকে অবাক করে থাকে। কিন্তু মেয়ে সন্তান, বিয়ে দিয়ে 'পরের ঘরে' পাঠাতে তো হবেই। সুপাত্র এদেশে এখনও প্রায় সর্বত্রই দুর্লভ। অতি বড় সুন্দরীরও অনেক সময় মনের মতো বর-ঘর জোটে না।

এহেন অবস্থায় ঊষার পরিবারের সকলেরই পছন্দমতো পাত্র জুটে গেল। কেবল তাই নয়, তারা আবার ঊষার মতো মেয়েকে বৌ করে ঘরে নিয়ে যেতে দেরি করতে নারাজ। এদিকে অন্তত এইচ এস না করে বিয়ে করতে রাজি নয় ঊষা। অন্যদিকে পাত্রপক্ষ দেরি করতে রাজি নয়, অথচ পাত্রীর যেন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা — আগে পরীক্ষা, তারপর বিয়ে।

এই টানাপোড়েনে পাত্রপক্ষ খুব বেশি হলেও ছ'মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি হলেন। ঊষাও এরকম নিমরাজি হয়ে বলল, ঠিক আছে, পাশ পর্যন্ত না হলেও পরীক্ষা দিয়ে তবেই সে ওসব বিয়ে-থা-য় রাজি।

ছট বললেই বিয়ের দিন হয় না। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান বলে কথা। তিথি নক্ষত্র, লগ্ন-এর ব্যাপারটা তো রয়েছে। আবার পরীক্ষাও যেদিন খুশি দেব বললে দেওয়া যায় না। তারও দিনক্ষণ ঠিক হয়ে থাকে। তা পড়বি তো পড়, বিয়ে আর পরীক্ষার দিন পড়ল গিয়ে একই দিনে। ওখানে আবার সকাল সকাল কনে নিয়ে যেতে বরের বাড়ির ডোলি আসে। ভোর ৫টায় তা এসে হাজির। কনে সেজে ডোলিতে উঠল ঊষা।

ওদিকে প্রথম দিনে ভার্নাকুলার বা মাতৃভাষার পরীক্ষার সময় সকাল ৭টা। অথচ ঊষা পরীক্ষা দিতে বদ্ধপরিকর। শিক্ষার সঙ্গে সে আপোষ করতে রাজি নয়।

না, ডোলি থেকে লাফ মেরে ও নেমে পড়েনি। হেঁইও.... হেঁইও করে ডোলিওয়ালাদের প্রায় একরকম তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে বরের বাড়িতে নেমেই দে ছুট পরীক্ষার হলে। অবশ্য সেই ডোলিতেই। সকাল ৬-৪৫ মিনিট। হলে এসে হাজির বিয়ের কনে। বাকীরা তখন পরীক্ষার কথা ভাববে কী, হাঁ করে তাকিয়ে ঊষার দিকে। ওই সাজেই পরীক্ষা দিয়ে গেল সেদিন। তারপরের পরীক্ষাগুলোও। পরে ফল বেরতে পাত্রী-পাত্র, দু পক্ষেরই চোখ কপালে। আশাতীত ভাল রেজাল্ট করেছে ঊষা।

আসলে যার জীবনে শিক্ষার আলোর পরশ লেগেছে, সেই আলোর ঊষালগ্ন শুরু হয়েছে শিশুকাল থেকেই, সেই ঊষা কী সেই আলোর প্রকাশ থেকে দূরে থাকতে পারে? সব আলোর বড় আলো যে জ্ঞানের আলো। উদয়পুরের ঊষা তার জীবনের অন্যতম খুশির লগ্নে তাকে প্রমাণ করে উদাহরণ হয়ে রইল বলা যেতে পারে।

কনের সাজেই পরী( া দিচ্ছে ঊষা।


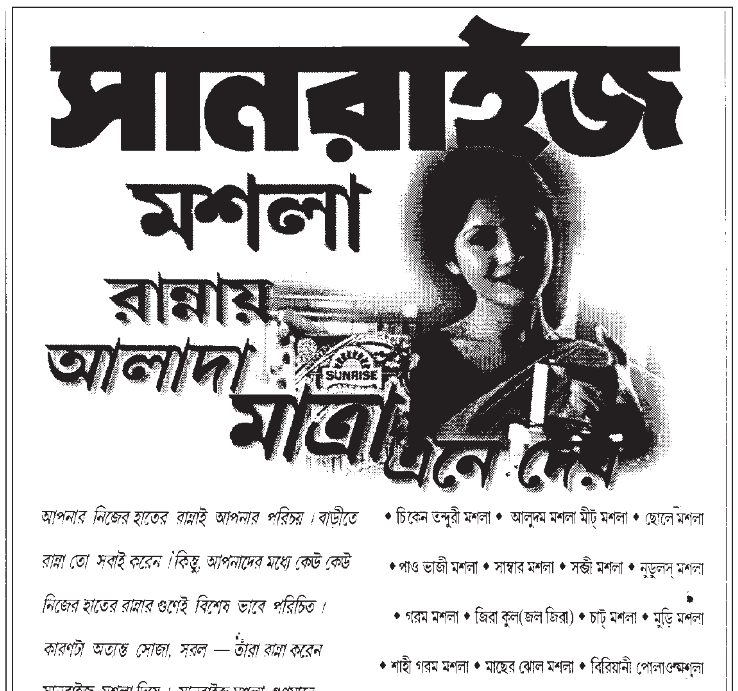

# বাংলাদেশী বহিষ্কার আন্দোলনকে বিপথচালিত করার চেষ্টা হচ্ছেঃ আসু

**নিজস্ব প্রতিনিধি** ।। যখনই অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের অসম থেকে বিতাড়িত করার কথা উঠে, ছাত্র সংস্থাগুলো আন্দোলনে নামে, তখনই তাকে সাম্প্রদায়িক বলে স্বার্থান্বেষী এক বিশেষ মহল বিপথচালিত করার চেষ্টা করে।' এই মন্তব্য করেছেন আসুর উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য। গত ২৭ আগস্ট গুয়াহাটিতে অসমের তিনটি বিশিষ্ট ছাত্রসংস্থা — অল অসম স্টুডেন্ট ইউনিয়ন, কারবি স্টুডেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন এবং ডিমাসা স্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের নেতারা এক বৈঠক করে যৌথভাবে বাংলাদেশী বিতাড়ন আন্দোলন জোরদার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সমুজ্জ্বলবাবু কয়েকটি যৌথ কর্মসূচী গ্রহণের সিদ্ধান্তও সাংবাদিকদের জানান। যেমন, ১৩ সেপ্টেম্বর কারবি আংলং জেলার সদর শহর দিফুতে আর একটি যৌথ বৈঠক হবে। তারপরই ডিমাসা জনজাতি অধ্যুষিত উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার সদর শহর হাফলং-এ ২৮ সেপ্টেম্বর একটি বড় জনসভা হবে। এরপর জনজাগরণ তীব্র করা এবং মানুষকে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ বিষয়ে সচেতন করার জন্য গুয়াহাটিতে ১ অক্টোবর বিরাট মানবশৃঙ্খল তৈরি করা হবে। বলা বাহুল্য, ছাত্রসংস্থাগুলি এসবই যৌথভাবে সামূহিক সাংগঠনিক শক্তিতে করবে। শ্রীভট্টাচার্য তাদের কর্মসূচী যাদের পছন্দ নয়, তাদেরকে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। এমন কী মুখ্যমন্ত্রীকেও বাংলাদেশীদের পক্ষ অবলম্বন করে কোনও বক্তব্য দেওয়া থেকে নিরস্ত হতে অনুরোধ করেছেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশী বিতাড়নের কথা উঠলেই আকারে-ইঙ্গিতে অথবা সরাসরিই তাদেরকে 'প্রকৃত ভারতীয় মুসলমান'-এর তকমা দেয় বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন, তাদের জন্য গঠিত রাজনৈতিক দল এবং কংগ্রেস। কারণটা বোঝা খুবই সরল — ওই সকল বাংলাদেশীরাই তাদের সলিড ভোটব্যাঙ্ক। আর বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী মুসলিমরা যে ভোটার তালিকায় ঢুকে পড়েছে তা গুয়াহাটি হাইকোর্টের বিচারপতির সাম্প্রতিক এক রায়েই প্রমাণিত। বাংলাদেশী ইস্যুতে তাঁরা নিজেরাই আইন হাতে তুলে নিচ্ছেন কিনা একথা জিজ্ঞাসা করাতে শ্রীভট্টাচার্য বলেন, 'না, আমরা আইনকে নিজেদের হাতে মোটেই তুলে নিচ্ছি না। যাদের নাগরিকতা নিয়ে সন্দেহ আছে তাদেরকে চিহ্নিত করে পুলিশকে তুলে দিচ্ছি। এরকম অভিযোগ করে রাজ্য সরকার 'বাংলাদেশী বিতাড়ন' বিষয়টাকেই বিপথচালিত করছে।'

*সমুজ্জ্ব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বাংলাদেশীদের বহিষ্কারের দাবিতে ছাত্রনেতাদের ধর্না।*

এদিকে কার্বি ছাত্র সংস্থার সভাপতির খারসিং এ্যাংলেং এক মারাত্মক খবর দিয়েছেন। তাঁর কথায় কার্বি আংলং জেলার মোট জনসংখ্যাই যেখানে তিন লাখ, সেখানে বাংলাদেশীদের সংখ্যাই এক লক্ষের বেশি। তিনি সোজাসুজিই বলেছেন, জেলাকে বাংলাদেশী মুক্ত করেই তাদের আন্দোলন থামবে। এখানে উল্লেখ্য যে, কারবি জনজাতি অধ্যুষিত স্বশাসিত জেলা কার্বি আংলং। ডিমাসা ছাত্র সংস্থার সভাপতি প্রফুল্ল হাফলং বলেছেন, অসম বাংলাদেশীদের গোডাউনে পরিণত হয়েছে।

## শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কোচবিহার জেলায় মালবাড়ী শাখার স্বয়ংসেবক, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পূর্ণকালীন কার্যকর্তা বসন্ত ভকতের বাবা সত্যনারায়ণ ভকত গত ২০ আগস্ট নিজ বাসভবনে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল ৯৬ বছর।

বর্তমানে ৫ পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি, নাতনীসহ বহু আত্মীয় পরিজনকে রেখে গেছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে সমাজ সেবার কাজে যুক্ত ছিলেন। তার কর্মকুশলতার জন্য মানুষ তাকে অনেকদিন মনে রাখবে।

❁ ❁ ❁ ❁

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শিলিগুড়ি রথমেলা শাখার মুখ্যশিক্ষক সুখরঞ্জন ভৌমিক, তার দুই দাদা নিরঞ্জন ও বিশ্বরঞ্জন ভৌমিকের মাতা বীণারাণী ভৌমিক গত ১৭ আগস্ট ৮১ বছর বয়সে দীর্ঘ রোগভোগের পর ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

❁ ❁ ❁ ❁

উত্তরবঙ্গ প্রান্তের পশ্চিম কোচবিহার জেলার ডাকঘড়ার পুরোনো স্বয়ংসেবক স্বপন কুমার সিংহের মাতৃদেবী মায়ারানী সিংহ গত ১ সেপ্টম্বর পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। তিনি স্বামী, ৩ পুত্র, ৪ কন্যা, নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

# আফগান মুজাহিদিন বাংলায় বহাল তবিয়তে

**নিজস্ব প্রতিনিধি** ।। ১৯৮৪ সাল থেকে ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাসরত হিজবুল মুজাহিদিনের সক্রিয় সদস্য আফগানী কাবুলীওয়ালা গুল মহম্মদকে অবিলম্বে ভারত থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিসন বেঞ্চ ।প্রধান বিচারপতি সুরিন্দর সিং নিজ্জর এবং বিচারপতি মহারাজ সিন্‌হা-র ওই ডিভিসন বেঞ্চের দুই বিচারপতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই নির্দেশ দেন। পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য গুল মহম্মদের আপীলের পরিপ্রেক্ষিতে ওই আদেশ। এর আগেই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত গুল মহম্মদের ভারতে থাকার আবেদন খারিজ করে দিয়ে তাকে তিন সপ্তাহের মধ্যে দেশ থেকে বিতাড়িত করার আদেশ দিয়েছিলেন। সেই আদেশের বিরুদ্ধেই গুলের আপীল লড়ছিলেন আইনজীবী কমলেশ ঝা। এই আইনজীবীর দাবি ছিল — গুল মহম্মদকে বিতাড়িত করলে তার বৌ-ছেলেমেয়েরা বিপদে পড়বে। অন্যদিকে সরকারি আইনজীবীদের বক্তব্য — গুল মহম্মদ আফগান নাগরিক। ১৯৮৪-তে শরণার্থী হিসেবে এদেশে সে আশ্রয় নিয়েছিল। আর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের রিপোর্ট অনুযায়ী সে হিজবুল মুজাহিদিনের সক্রিয় সদস্য। এবং ভারতবিরোধী কাজে লিপ্ত। সে পাক ও আফগান নাগরিকদের কাছ থেকে টাকা তুলে আফগানী তালিবানদের জন্য পাকিস্তানের পেশোয়ারে পাঠাতো। 'বিদেশী' আইন ভঙ্গ করার অপরাধে তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। সেজন্য ৩৫ দিন জেল খেটেছে।

১৯৯৭ সালে কেন্দ্র সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বলেছিল গুল মহম্মদকে দেশ থেকে বিতাড়ন করার জন্য। গুল কলকাতার নগর দেওয়ানি আদালতেমামলা করে। নগর দেওয়ানি আদালতে কেন্দ্র সরকারের নির্দেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। পরে সব পক্ষের বক্তব্য শুনে আদালত গুল মহম্মদের বক্তব্য খারিজ করে দেয়। ওই খারিজ করার আদেশের বিরুদ্ধে গুল কিন্তু উচ্চ আদালতে আপীল করেনি। সরকারি আইনজীবীরা হাইকোর্টকে জানান, আদালতে মামলা না থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর বিস্ময়করভাবে গুল মহম্মদকে ভারত থেকে বিতাড়িত করেনি। শেষ পর্যন্ত ২০০৮ সালের ১ জানুয়ারি রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে গুল মহম্মদকে দেশ ছাড়ার নির্দেশ দেয়। রাজ্য সরকারের ওই আদেশের বিরুদ্ধে গুল মহম্মদ হাইকোর্টে রিট মামলা করে।

এই ঘটনাটি আসলে হিমশৈলের উপরিভাগ মাত্র। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, গুল মহম্মদ আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তান পার হয়ে ভারতে ঢুকে কলকাতায় পৌঁছাল কীভাবে? এদেশে বহাল তবিয়তে ২৫ বছর কাটিয়ে দিলই বা কী করে? এরকম আরও কত আছে? এদের জন্য ভারতীয় আইনজীবীরা মামলা লড়তে রাজী হয় কী করে? আর 'কাবুলীওয়ালার বৌ সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের' ঘটনা তো সবার জানা। কলকাতাবাসিনী সুস্মিতা কাবুলীওয়ালাকে বিয়ে করে আফগানিস্তানে পাড়ি দিয়েছিল। পরে তার নারীত্ব, সতীত্ব লাঞ্ছিত অপমানিত হয়। তার নিজেরই কথায় — অনেককে দেহ দিয়ে তাকে আবার কলকাতায় ফিরে আসতে হয়। ফিরে আসার পরও সংবাদমাধ্যমে মুখ খোলায় কাবুলীওয়ালারা সেই ২০০০ সালেই তাকে তার কলকাতার বাড়িতে চড়াও হয়ে মারধর করে। এঘটনা কয়েক বছরের পুরনো।

তাই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে আরও কত গুল মহম্মদ কলকাতায় সংসার পেতে হিজবুলের হয়ে কাজ করছে? তার জন্য গোয়েন্দা বিভাগই বা এব্যাপারে কতটা সচেষ্ট? বিশেষত বিষয়টা যখন দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত। আর পেশার খাতিরে ভারত-বিরোধী সন্ত্রাসবাদীদের হয়ে আইনজীবীদের সওয়াল করার বিষয়টি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

# যত্রতত্র বেআইনী মাংস বিক্রিতে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে ইসলামপুরে

**মহাবীর প্রসাদ টোডি** ।। ইসলামপুর পুরসভার আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় চলছে প্রকাশ্যে মাংস কাটা। নিয়মমতো কালো কাঁচ কিংবা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখার নির্দেশ থাকলেও প্রায় কোনও দোকানদারই এইসব নিয়মের তোয়াক্কা করেন না। এক সময় বিষয়টি নিয়ে বহু অভিযোগ ওঠায় পুরসভা প্রকাশ্যে মাংস কাটার বি(দ্ধে কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিল। কিন্তু পুরসভার অভিযানে ঢিলেমি থাকায় এ সমস্যার সমাধান হয়নি। এতে বাড়ছে দৃশ্য দূষণ। পথচলতি শিশুদের মধ্যে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশু পড়ুয়াদের মধ্যেই এর কুপ্রভাব বিশেষভাবে পড়ছে বলে প্রকাশ।

এছাড়া অধিকাংশ দোকানের ট্রেড লাইসেন্সই নেই। শহরের বেশ কিছু বাজার এলাকায় মাংস কাটার নির্দিষ্ট স্থান থাকলেও জাতীয় সড়কের দু'পাশ সহ অলিতে-গলিতে যত্রতত্র গজিয়ে উঠেছে মাংসের দোকান। আবার কিছু দোকানে বাসি-পচা মাংসও বিত্রি( হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বেশ কিছু মহল থেকে একথা বলা হয়েছে যে, পুরসভার তরফে নিয়মিতভাবে অভিযান চালিয়ে বেআইনিভাবে মাংস বিত্রি( বন্ধ করা উচিত।

এদিকে পৌরসভার ফুড ইনস্পেক্টর-এর বক্ত(ব্য হল, পৌরসভার তরফে নিয়মিত অভিযান চালিয়ে বেআইনিভাবে মাংস বিত্রি( বন্ধ করা সম্ভবপর নয়। যদি না এলাকার জন-সাধারণ সচেতনভাবে প্রতিবাদ করে। তবে এ বিষয়ে পুর কর্তৃপ(ের গা-ছাড়াভাব থাকার ফলে প্রকাশ্যেই অবাধে শহরের যত্রতত্র নিয়মিতভাবে মাংস কাটা হচ্ছে। এমনকী অনেক সময় স্কুল-হাইস্কুলের গা ঘেঁষেও কাটা মাংস বিত্রি( করতে দেখা যাচ্ছে।


Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

*Authrorised Distributor :*

**NATIONAL PIPE & SANITERY STORES**

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

**PARTHA SARATHI CERAMICS**

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

সকল প্রকার স্টীল ফার্নিচারের জন্য যোগাযোগ করুন

Dass Steel Co.

Mirchak Road. - Malda
Ph. No. 266063

*ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়,*
*রোদ বৃষ্টিতে কিসের ভয়!*

**অক্ষয় কুমারপালের ফোল্ডিং ছাতা**

বড়বাজার,কলকাতা-৭০০ ০০৭,
ফোন ঃ ২২৪২৪১০৩

**Ganesh Raut** (B.Com)

*Govt. Authorised Agent* **L.I.C.I.**

***Contact For Better Service***

2521-0281, 94323-05737

# পরিস্থিতি অনুকূল দেখে বিজেপিতে ঝুঁকছেন কং-জেডিএস নেতারা

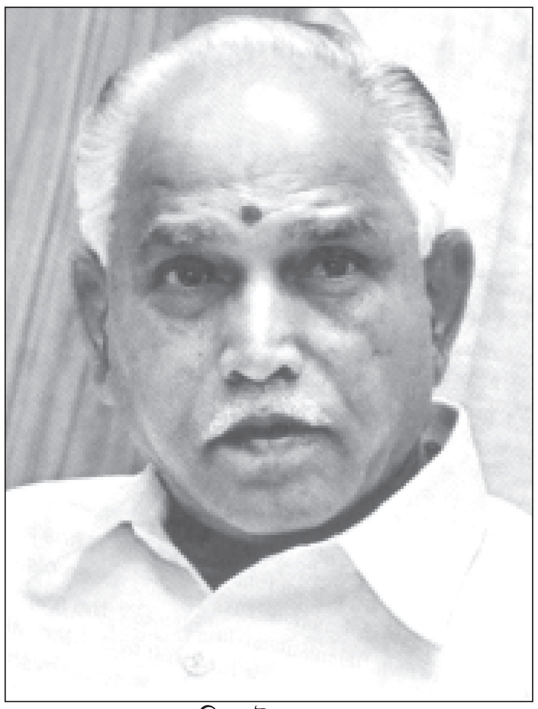
বি এস ইয়েদুরাপ্পা

**নিজস্ব প্রতিনিধি** ।। লোকসভার নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে কর্ণাটকে বি জে পি'র পা ততই বেশি শক্ত হতে দেখা যাচ্ছে। মাস তিন-চার আগেও যারা বি জে পি'র মুণ্ডপাত করতে রাস্তায় নেমেছিলেন সেই কংগ্রেস এবং জনতা দল (এস)-এর রাজনৈতিক রথীদের কেউ কেউ সেই বি জে পি'র পক্ষে চলে আসতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। বস্তুত ৬ জন নির্দলের সমর্থনের জোরে রাজ্যে বি জে পি সরকার গড়েছে। সেই সুবাদে নির্দলরা যথারীতি সুবিধা আদায় করে নিয়েছে। কিন্তু তারপরও তাদের মতিগতি সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত নয় বি জে পি। কারণ নির্দলদের আরও বেশি পাইয়ে দেবার লোভ দেখিয়ে যাচ্ছে কং, জে ডি এস দু'দলই। আর নির্দলদের একটা সুবিধা হল, যেহেতু তারা দলহীন সেজন্য দল ভেঙে বেরিয়ে আসার জন্য কাউকে এক তৃতীয়াংশের আইনী ফ্যাসাদে পড়তে হয় না। তাই বি জে পি-ও সরকার গড়ার পর থেকেই চেষ্টা চালাচ্ছে যাতে কংগ্রেস এবং জে ডি এস থেকে বিধায়ক ভাঙিয়ে আনা যায়। এবার তাতে বি জে পি কিছুটা সফল হয়েছে বলা যেতে পারে। কংগ্রেস এবং জে ডি এস দু'দল থেকেই ২ জন করে শীর্ষস্থানীয় নেতা বি জে পি-তে যোগ দিয়েছেন। রাজ্য বিধানসভায় নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতার জন্য ১১৩ জনের দরকার। সেখানে বি জে পি'র পিছনে সমর্থক সংখ্যা এখন রয়েছে ১১৬ জন। তার মধ্যে বিজেপি'র একারই ১১০ জন।

রাজ্যের কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে অভিযোগ করেছেন যে বি জে পি মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা চেষ্টা চালাচ্ছেন কংগ্রেস এবং জে ডি এস বিধায়কদের একাংশ পদত্যাগ করে ফের উপনির্বাচনে দাঁড়াক। বি জে পি অর্থ এবং কর্মীদের যোগান দিয়ে তাদের জিতিয়ে আনবে বি জে পি'র প্রার্থী হিসাবে। বস্তুত এখানে বি জে পি'র বিশেষ করে ইয়েদুরাপ্পার ইমেজ এতটাই ভাল যে অনেকেরই ধারণা এখন কোথাও উপনির্বাচন হলে তাদের প্রার্থীর জয়ের সম্ভাবনা অনেক বেশি। রাজ্য বি জে পি সভাপতি সদানন্দ গৌড়া অবশ্য রাজ্য কংগ্রেস সভাপতির অভিযোগ এক কথায় নস্যাৎ করে দিয়েছেন।

বি জে পি'র বক্তব্য কংগ্রেস এবং জে ডি এস ধড়িবাজি করতে গিয়ে ক্ষমতাচ্যুত হবার পর থেকেই এই দুই দলে অভ্যন্তরীণ কোন্দল শুরু হয়ে গেছে। এখন দলকে বাঁচাতে মরিয়া হয়েই তারা বি জে পি'র বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতে শুরু করেছেন। দলীয় নেতৃত্বের নীতি ও ভূমিকায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে কংগ্রেস এবং জে ডি এস নেতা ও বিধায়করা বি জে পি'র নৌকোয় ওঠার কথা চিন্তা-ভাবনা করছে। নিজেদের দলে অপাংক্তেয় হয়ে পড়া বা নেতাদের ব্যবহারে হতাশ হয়েই তারা দল থেকে বেরিয়ে আসছেন এবং আসতে চাইছেন।

কংগ্রেস সভাপতির অভিযোগ যে সর্বৈব সত্য নয় জনৈক কংগ্রেস বিধায়ক আনন্দ শঙ্করের বক্তব্য থেকেই তা পরিষ্কার। তিনি বলেছেন, নির্বাচনের আগে জে ডি এসের সঙ্গে কংগ্রেসের যে সাপে নেউলে সম্পর্ক ছিল নির্বাচনের পর তারা ফের যেভাবে হাত মেলনোর চেষ্টা করেছে তাতে কংগ্রেসের ওপর মানুষের আস্থাটাই নষ্ট হয়ে গেছে। তাছাড়া তিনি তাঁর নির্বাচনী ক্ষেত্রে উন্নয়ণ চান। বি জে পি সরকারই সেটা করতে পারে বলে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে বি জে পিতে যোগ দিয়েছেন। প্রায় একই সুর দেবগৌড়ার জনতা দল (সেকুলার)-এর দলছাড়া বিধায়কদেরও। দুই দলের এই ৪ জন দলত্যাগ করে বিধানসভার সদস্য পদে ইস্তফা দেওয়ায় আসনগুলি শূন্য হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুসারে ৬ মাসের মধ্যে সেখানে উপনির্বাচন হবার কথা। বি জে পি তাদের জিতিয়ে আনার জন্য স্বাভাবিকভাবেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অন্যদিকে কংগ্রেস এবং জে ডি এস অভিযোগের তীর শানালেও দুই শিবিরেই স্পষ্টতঃই হতাশার ছায়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

# চীনা শিল্পের রমরমা বাড়াতে মরিয়া কেরলের বাম-জোট সরকার

**নিজস্ব প্রতিনিধি** ।। শেষ পর্যন্ত রাজ্যে 'সেজ' নিয়ে দলীয় কোন্দলে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে সি পি এমের পলিটব্যুরোকে। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে রাজ্যে প্রায় এক ডজন নতুন শিল্প স্থাপনে 'মৌ' সই হয়ে যাবার

ভি এস অচ্যুতানন্দন

পিনারাই বিজয়ন

পরও পড়ে ছিল। বিতর্ক বেঁধেছিল রাজ্যের সি পি এম মুখ্যমন্ত্রী ভি এস অচ্যুতানন্দন এবং সি পি এমের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক পিনারাই বিজয়নের মধ্যে। পিনারাই গোঁ ধরেছিলেন বড় শিল্পপতিদের বিনিয়োগ করানো চলবে না। কারণ তারা 'বুর্জোয়া' এবং 'পুঁজিপতি'। আর অচুতানন্দনের বক্তব্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব বাবুর মতো, — শিল্পের জন্য টাকা চাই। সুতরাং টাটা হলেও তাদের টা-টা করা চলবে না। ফলে রাজ্যে শিল্পের গাড়ি চলবে চলবে করেও চলছিল না।

শেষ পর্যন্ত পলিটব্যুরো দু'ই যুযুধান নেতাকে একঘাটে এনে বৈঠক করে গত ৭ সেপ্টেম্বর প্রায় একরকম চাপিয়ে দেবার মতো নির্দেশ দিয়েছেন — কেরলে 'সেজ' চালু হবে। সেজন্য এল ডি এফ সরকারের শরিক দলগুলোর সাথে যেন অবিলম্বে কথাবার্তা চালু করা হয়।

কিন্তু শুরুতেই আবার গোল বেঁধে গেছে। কারণ কেরলের সি পি এম মুরুব্বির সরকার শিল্পের জন্য যতটা না, তার চাইতে বেশি মতলব ভাঁজছে রাজনৈতিক মতাদর্শের দিকে। তারা চেষ্টা চালাচ্ছে দুই কমিউনিস্ট দেশ চীন এবং কিউবা'র সঙ্গে মেমোরেণ্ডাম অব আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং বা 'মৌ'-এর চুক্তি করতে। যাতে সি পি এমের মণিটর চীন এবং সি পি এমের রাজনৈতিক দোসর কিউবা এখানে শিল্প স্থাপন করে লাভ তুলে নিয়ে যেতে পারে। তাতে এখানকার সি পি এমের 'বড়দা'র নেক নজরে থাকতে পারবেন সি পি এম নেতারা। 'ছোটভাই' কিউবাকে যেন টেনে তোলার ঠেক নিয়েছেন কেরলের সি পি এম নেতারা। কিউবার জন্য এখান থেকে জাহাজ ভরে চাল-গম পাঠানোর রাজনৈতিক হিড়িক একাধিকবার পড়েছে এখানে। এখন কেরলে তাদের জন্য শিল্পের জায়গা দিতে এল ডি এফ সরকার একরকম বদ্ধ পরিকর।

একদিকে যখন আইনী-বেআইনী পথে চীনা জিনিসে এখানকার বাজার ছেয়ে যাচ্ছে, তখন অচ্যুতানন্দন সরকার তথা সি পি এম চীনকে কার্যত এখানকার অর্থনীতিতে কব্জা জমানোর সুযোগ করে দিচ্ছে বলে বিভিন্ন স্তর থেকে অভিযোগ উঠছে। বিশেষ করে কাজুবাদাম ও কাজুর খোলা থেকে উৎপাদিত তেল, সিরামিক (চলতি কথা চিনামাটির জিনিসপত্র), স্ক্যানিং টেকনোলজি, ঔষুধ শিল্প ইত্যাদি।

এর ওপর আরও যে ঘটনাটি ঘটছে সেটা হল বাম-মোর্চা সরকারের তত্ত্বাবধানে কমিউনিস্ট চীন এখানে ইন্দো-চীন অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিষদের একটি সাব অফিস খোলার পরিকল্পনা নিয়েছে।

যতদূর জানতে পারা গেছে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে কেরলের পর্যটন মন্ত্রী কোদিয়েরি বালকৃষ্ণণ, শ্রমমন্ত্রী পি কে গুরুদাসন, শিল্পমন্ত্রী এলামারোম করিম চীনে যাবার পরিকল্পনা নিয়েছেন। আর কিউবায় যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী পি কে শ্রীমতী। ভারতে নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত ঝাঙ ইয়ান গত মাসে কেরলে এসেছিলেন। এসব নিয়ে এল ডি এফের শরিক দলগুলোর মধ্যে তীব্র অসন্তোষ জমা হয়েছে। কিন্তু মোর্চা সরকারের পাণ্ডা সি পি এম-এর এক নেতা শরিক দলগুলোর ক্ষোভকে কোনও পাত্তাই দিতে রাজি নন। এদিকে শোনা যাচ্ছে, পলিটব্যুরো নির্দেশ দিলেও পিনারাই বিজয়ন নাকি তলে তলে সরকারের শরিক দলগুলোর অসন্তোষকে উস্কে দিচ্ছেন।

**স্বস্তিকার দাম**
**প্রতি সংখ্যা - ৪.০০ টাকা**
**বার্ষিক গ্রাহক মূল্য**
**সডাক্ - ২০০.০০ টাকা**

# যে কোনও মূল্যে কংগ্রেসকে হারাতে তৈরি টি আর এস

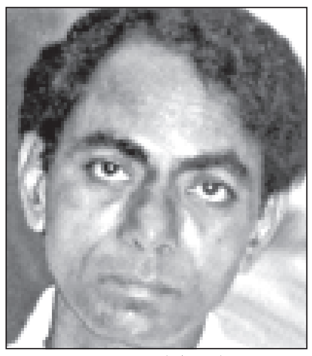
কে চন্দ্রশেখর রাও

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। অথৈ জলে ভাসতে থাকা দুই দল এখন খড়কুটোর মতো হলেও একে অপরকে আঁকড়ে ধরে তীরে উঠতে মরিয়া। তার একটি এন ডি এ-তে থেকে অন্ধ্রপ্রদেশে ৫ বছর আগেও 'রাজত্ব করেছে। আর একটি দল গত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের হাত ধরে নিজেদের হাত পুড়িয়েছে। একটির নাম তেলুগু দেশম পার্টি বা টি ডি পি। অন্যটি তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি বা টি আর এস।

টি ডি পি-এর আগে বিরোধিতা করলেও এখন বুঝতে পারছে পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্যের দাবি সমর্থন না করলে পায়ের তলার মাটি থাকবে না। আর টি আর এসও বুঝেছে দোসর ছাড়া জেতা যাবে না। সম্প্রতি টি ডি পি'র পরিষদীয় দলের কোর কমিটির বৈঠকে এ নিয়ে বিস্তর আলোচনার পর ঠিক হয়েছে টি আর এস নেতা কে চন্দ্রশেখর রাও-এর সঙ্গে হাত মেলানো হবে। কেবল বামেদের সঙ্গে থাকলে চলবে না। কারণ, বিজেপি প্রথম থেকেই 'ছোট রাজ্যের ইস্যুতে তেলেঙ্গানার পক্ষেই কথা বলে আসছে। এদিকে কংগ্রেস এই ইস্যুতে বিরোধিতা করে ব্যাপকভাবে জনসমর্থন খুইয়ে বসে আছে।

চন্দ্রবাবু নাইডুর দলের ১৪ জন বিধায়ক ওই বৈঠকে টি আর এসের সঙ্গে হাত মেলানোর পাশাপাশি ফের এন ডি এ-তে ঢোকার মত প্রকাশ করেছেন বলেও জানা গেছে। পাশাপাশি টি আর এস এখনও পর্যন্ত পরিষ্কার করে বলেনি যে তারা বি জে পি-র সঙ্গে কোনও জোট করবে না। তাই টি ডি পি'র ভয়, টি আর এস শেষ পর্যন্ত এন ডি এ-

তে গেলে এবং বিশিষ্ট অভিনেতা চিরঞ্জীবীর নতুন দল 'প্রজা রাজ্যম' তাদের সঙ্গে হাত মেলালে আগামী নির্বাচনে লড়াইটা হবে মুখ্যত কংগ্রেস বনাম ওই জোটের মধ্যে। মাঝখান থেকে মার খাবে চন্দ্রবাবু নাইডুর টি ডি পি।

মুখ্যত ভোট টানাটানির এমন সমীকরণ টি ডি পি এবং টি আর এস দুই দলকেই হাত মেলানোর রাস্তায় যেতে এক প্রকার বাধ্য করছে। তবে চন্দ্রবাবু ফের এন ডি এ-তে আসতে চাইলে তাকে

*(এরপর ১০ পাতায়)*

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

# অনুপ্রবেশ ও নির্বাচনী রাজনীতি

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রদপ্তরের একটা রিপোর্ট থেকে জানা গিয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গের ৫৩টা বিধানসভা এবং অসমের ৪০টা বিধানসভার ফলাফল বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের ভোটের দ্বারাই নির্ধারিত হয়। অবশ্য অনেক আগেই বিভিন্ন প্রাবন্ধিক এই ধরনের একটা আভাস দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বরাষ্ট্রদপ্তর তার গোয়েন্দাদের দিয়ে এই সমীক্ষা চালানোর ফলে আরও বেশি নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া গেল। তার অর্থ হল — পশ্চিমবঙ্গ, অসম প্রভৃতি রাজ্যে কারা মসনদে বসবেন সেটা মূলত নির্ধারিত হয় অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা, বৈধ ভোটারদের ব্যালটে নয়।

এই ধরনের আজব কাণ্ড বোধ হয় শুধু এই দেশেই হয়।

উক্ত রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী কোচবিহার, দুই দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং চব্বিশ পরগণায় রয়েছে এই নির্বাচন কেন্দ্রগুলো। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রিপোর্টে বলা হয়েছে এই রাজ্যের ২৯৪ টা নির্বাচন কেন্দ্রের ৫৩ টাতেই (অর্থাৎ ১৮ শতাংশ) ভোটের ফলাফল নির্ভর করে এই অবৈধ ভোটারদের ভোটে। আরও জানা গিয়েছে — অসমে ৪০টি বিধানসভা কেন্দ্রের (অর্থাৎ ৩০ শতাংশ) ফলাফলও নির্ধারিত হয় এভাবে। সুতরাং বলা চলে, ভোটটা এই দেশের নাগরিকদের দেওয়ার কথা হলেও অন্য রাষ্ট্রের মানুষও অবাধে এই ভোট ক্রিয়ায় অংশ নেয়, এবং তাদের ভোটেই রাজনৈতিক উত্থান-পতন ঘটে। এই ধরনের কথা আমরা আগে যখন লিখেছি, তখন আমাদের বি জে পি বা আর এস এস বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু এবার স্বরাষ্ট্র দপ্তর ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে এই ভয়াবহ সমস্যার রূপ তুলে ধরেছে, নেতা / মন্ত্রীরা বালিতে উটের মতো মুখ গুঁজে পড়লেই কি দেশবাসী আসন্ন সর্বনাশ থেকে রেহাই পাবেন?

এই রিপোর্টে আছে — এখন পশ্চিমবঙ্গে অন্তত ৮০ লক্ষ, ত্রিপুরায় ৪ লক্ষ, বিহার ও ঝাড়খন্ডে ১০ লক্ষ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী আছে। আরও জানা গিয়েছে দুই দিনাজপুর, কোচবিহার, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদহ এবং দুই ২৪ পরগণা হয়ে উঠেছে অনুপ্রবেশকারীদের স্বর্গভূমি। এরা থাকে, আসে-যায়, ভোট দেয়, অন্য কিছুও করে।

গোয়েন্দাদের মতে, এই দেশে নাশকতা সৃষ্টি ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য পাক সংস্থা আই এস আই যে ছক তৈরি করেছে, এই অনুপ্রবেশ তারই অঙ্গ। তাছাড়া আই এস আই-র মদতপুষ্ট 'মুঘলিস্তান রিসার্চ ইন্সটিটিউট অফ বাংলাদেশ' (এম আর আই/ বি)-কে 'মুঘলিস্তান'-এর মানচিত্র প্রকাশ করেছে, তাতে বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও বিহারের একটা বড় অংশকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য, অনুপ্রবেশ চলছে এই অঞ্চলেই। ভবিষ্যতে কোনও একদিন এই সব অঞ্চলে জন অনুপাতের কারণে যদি প্লেবিসাইটের (গণভোট) প্রস্তাব ওঠে তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিছুই থাকবে না। আবার হয়ত ঘটবে দেশের অঙ্গচ্ছেদ।

মনে পড়ছে একবার অসমের রাজ্যপাল এস. কে. সিন্হা কেন্দ্রকে জানিয়েছিলেন যে, অসমে যেভাবে অনুপ্রবেশ ঘটেছে তাতে রাজ্যটা মুসলিম গরিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারে। আর সেই সময় বি এস এফ-এর কর্তা ব্যক্তিরা বলেছিলেন — তাঁরা অনুপ্রবেশ-কারীদের ধরলেও এই বঙ্গের স্থানীয় নেতারা তাদের ছাড়িয়ে নেয়, রেশনকার্ড দিয়ে ভোটার বানায় যাতে তারা ভোটে অংশ নিয়ে সংশ্লিষ্ট দলকে জয়লাভে সাহায্য করতে পারে। এই সব নেতারা কালিদাসের মতো যে ডালে বসে, সেই ডালই কাটে — কারণ তাদের কাছে দেশের সুখ-সমৃদ্ধির কোনও দামই নেই, দলীয় স্বার্থ ও ব্যক্তিগত লাভই এদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

স্বরাষ্ট্রদপ্তর জানিয়েছে — এই মুহূর্তে আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে বাংলাদেশের হারকৎ উল্ জেহাদি ইসলামি (হুজি) সব চেয়ে বিপজ্জনক ভূমিকা নিয়েছে। আর আই এস আই-র সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থা ডি পি এফ আই। অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে আমাদের নিরাপত্তা তো বটেই, জাতীয় সত্তাকে ধ্বংস করাই তাদের উদ্দেশ্য। ভোটে অংশ নিয়ে প্রকৃত জনমতকে ভিন্নভাবে প্রতিফলিত করাও তাদের প্ল্যানের অন্তর্গত। কম্যুনিস্ট ও কংগ্রেসীরা এদের দোসর।

বিস্মিত হয়ে খবরে পড়ি — গত এক দশকে মুসলিম জনসংখ্যা বেড়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ৩৪ শতাংশ, উত্তর ২৪ পরগণায় ২৩ শতাংশ, নদীয়ায় ২২ শতাংশ, মুর্শিদাবাদে ২৮ শতাংশ, মালদহে ৩১ শতাংশ, কলকাতায় ১৯ শতাংশ, এবং জলপাইগুড়িতে ৩২ শতাংশ। প্রশ্ন হল — বৃদ্ধির হার কলকাতায় ১৯ শতাংশ হলে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে ২৮ শতাংশ, ৩১ শতাংশ, ৩২ শতাংশ হয় কেমন করে? স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মতে, এই অদ্ভুত অবস্থা ঘটেছে ব্যাপক অনুপ্রবেশের ফলে। এর ফলে জাতীয় নিরপত্তাই শুধু বিঘ্নিত হচ্ছে না, নির্বাচনী ফলাফলও নির্ধারিত হচ্ছে। সমস্যা দেখা দিয়েছে বাসস্থান নিয়ে।

বিপুল চাপ পড়েছে অর্থনীতির ওপরেও। এখন নাকি এই দেশে অনুপ্রবেশকারীর মোট সংখ্যা দেড় কোটির বেশি। এতগুলো মানুষের দায় আমরা বইব কেন? বিশেষ করে, তাদের অনেকের পরিচয়, গতিবিধি, ক্রিয়াকলাপ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। আরও বড় প্রশ্ন — তারা অন্য রাষ্ট্রে ভোট দেয় কীভাবে?

কিছু ন্যাকা বুদ্ধিজীবীর কথা শুনুন — সীমান্ত অনুপ্রবেশ — এই সব কথা উঠছে কেন? একই চেহারা, একই ভাষা — আসা যাওয়া তো থাকবেই। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্তও এমন কথা বলেছিলেন।

বাঃ। এই না হলে আমাদের দেশের মন্ত্রী! আচ্ছা, দুই জার্মানীর মধ্যে, দুই কোরিয়া ও দুই ভিয়েতনামের মধ্যে সীমান্ত প্রহরা ছিল না, বা নেই? দুই বার্লিনের মধ্যে পাঁচিল উঠল কেন এবং সেটা টপ্কানোর জন্য হাজার-হাজার মানুষ প্রাণ দিলেন কেন? চেহারার ধরন ও ভাষা একই ছিল না? পশ্চিমবঙ্গের কর্ণধার বুদ্ধবাবুও আগে বলতেন — অনুপ্রবেশের সমস্যা তেমন কিছু নয়। এখন তাঁর সরকারই এটা নিয়ে নাকি চিন্তিত। অনুপ্রবেশকারীরা নাকি এমন ভাবে সীমান্তের নাগরিকদের সঙ্গে মিশে গেছে যে, তাঁদের সনাক্ত করা কঠিন।

কিন্তু কেন? সীমান্ত অঞ্চলের বসবাসকারীদের যদি গত দশ বছর আগের পরিচয়পত্র, পেশা, ঘরবাড়ির নথি ইত্যাদি পরীক্ষা করা যায়, তাহলে কি জাল-ভেজালটা ধরা পড়ে না? সদিচ্ছাটাই হল আসল কথা — তৃতীয় হাত অর্থাৎ অজুহাত কিছু নয়। অবশ্যই এর মূলে আছে সেই রাজনীতি। সেই ভোটযুদ্ধ। আর তার সঙ্গে যুক্ত মাফিয়া, প্রমোটার, দালাল, গুন্ডা ও পুলিশ — 'ক্ষমতা স্বর্গঃ, ক্ষমতা ধর্মঃ, ক্ষমতা হি পরমং তপঃ'।

আমাদের এই প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, দেশের সম্পদের ওপর প্রথম অধিকার নাকি মুসলমানদেরই। আর সেই সমাজের মৌলবাদীদের সন্তুষ্ট করার জন্য পার্ক সার্কাস নাটকের পর তসলীমা নাসরিনকে তাড়িয়ে দিতে হয়েছে 'ধর্মনিরপেক্ষ'দের' রাজ্য থেকে। এখন শুধু সুকুমার রায়ের 'আলোয় ঘেরা অন্ধকার'।

*এই ভাবেই খোলা সীমান্তে পারাপার চলছে।*

# অনুপ্রবেশ সমস্যা বহুমুখী

**সতীনাথ রায়।।** পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ গুরুতর সমস্যা বললে বোধ হয় কম বলা হয়। ভৌগোলিক সীমানা ও সর্বোপরি রাজনৈতিক দলগুলির মদত অনুপ্রবেশ সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রশাসনিক দুর্বলতা। এই শিথিলতারই ফায়দা তুলে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা কাঁটাতারের বেড়া পার হয়ে খুব সহজেই কলকাতাসহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগণা, মালদা, দিনাজপুর সহ ৯টি জেলা পর্যবেক্ষণ করলে খুব সহজেই অনুমান করা যায় বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের বাড়বাড়ন্তটা কতটা। উচ্চ পদস্থ অফিসাররাও জানেন। সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে কীভাবে প্রতিনিয়ত বাংলাদেশীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু প্রশাসনিক স্তরের নিষ্ক্রিয়তা এবং রাজনৈতিক দলগুলির ভোট সর্বস্ব রাজনীতির জোরে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা খুব সহজেই এই সকল জেলাগুলিতে অবাধে বিচরণ করছে। এবং রাজনৈতিক নেতাদের ভোট ব্যাঙ্ককে মজবুত করছে। আবার এই অনুপ্রবেশকারীরাই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌছে বিভিন্ন নাশকতামূলক কাজকর্মে যুক্ত হয়ে নিজেদের পায়ের মাটিকে পরোক্ষভাবে শক্ত করছে। দেশের বিভিন্ন অংশে নাশকতামূলক কাজকর্মের সঙ্গে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের যোগসাজসের চিত্রটাও রীতিমতো আঁৎকে ওঠার মতো।

গ্রেপ্তার হওয়া বাংলাদেশীদের বেশিরভাগজনেরই বাংলাদেশ স্থিত (হুজি) হরকৎ-উল-জিহাদ-অল্ ইসলামি বাংলাদেশ-এর সঙ্গে যোগাযোগের প্রত্যক্ষ প্রমাণ উদ্ধার হয়েছে। ১০ জানুয়ারি নারকেলডাঙায় গ্রেপ্তার হওয়া আববাস খান ছিল লস্কর এ তৈবার সক্রিয় কর্মী। ১৬ জুলাই পুলিশ সন্দেহভাজন এক আই এস আই গুপ্তচরকে শিলিগুড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। ২৯ জুলাই দিল্লী পুলিশ হাকিম নামের জনৈক বাংলাদেশীকে গ্রেপ্তার করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ শিলিগুড়িতে নিয়ে আসে। হাকিমের সঙ্গে জঙ্গিদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের প্রমাণও পুলিশ উদ্ধার করেছে।

আবার বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীরা অবৈধভাবে বৈদেশিক মুদ্রা পাচার করেও দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলার চেষ্টা করছে। ৭ আগস্ট মালদা জেলা থেকে বি এস এফ প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ও গোপন মানচিত্র উদ্ধার করে। বি এস এফ-এর প্রাথমিক ধারণা এগুলি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের হাত ধরেই এদেশে আনা হয়েছে। তারা ভারতের আরও গভীরে ঢোকার চেষ্টা করছিল বলেও তাদের অনুমান। চলতি বছরে সি আই ডি যে ১২ জন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেছে, তারা সকলেই কোনও না কোনও জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে জড়িত। এদের মধ্যে সব থেকে বড় গ্রেপ্তারি হয় গত ৩০ জুলাই, মহম্মদ মুস্তাক ও মহম্মদ নজরুল। এদের দুজনকেই মুর্শিদাবাদ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

২০০১-র ২২ জানুয়ারিতে কলকাতার বুকে আমেরিকান সেন্টারের ওপর যে আক্রমণ হয়েছিল তা ভুলে যায়নি মানুষ। পার্ক স্ট্রিটের ম্যাকডোনাল্ডস্-এর ঘটনাও কম বড় উদাহরণ নয়। কে বলতে পারে আজকের সকালটা তারা নিমেষের মধ্যে অশুভ করে দিতে পারে না। অনুপ্রবেশ সমস্যা শুধু একমুখী সমস্যা নয় বহুমুখী সমস্যা। কেন্দ্রীয় ইউ পি এ সরকারের নমনীয় মনোভাব এতে আরও ইন্ধন জুগিয়েছে।


নেত্রদান মহাদান

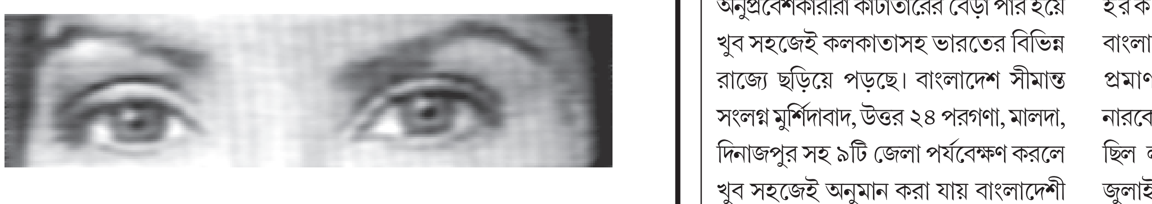

**EYE BANK**

23218327, 23592931, 22413853
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ **22181995, 22180387**

*সৌজন্যে ঃ কলাভারতী*

# অনুপ্রবেশকারীদের বহিষ্কার শাস্তি নয় একটি প্রক্রিয়া মাত্র

**জে পি রাজখোয়া**

গুয়াহাটি হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি বি. কে. শর্মার কামালুদ্দিন বহিষ্কার মামলার রায় একদিকে যেমন জাতীয়তাবাদী সংস্থা ও ব্যক্তিদেরকে বাংলাদেশী চিহ্নিতকরণ ও বিতাড়ন বিষয়ে উৎসাহিত করেছে, তেমনই ভোটভিক্ষু রাজনৈতিক দল এবং বাংলাদেশী মুসলমানদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দাতাদের কায়েমী স্বার্থের মৌচাকে ঢিল ছোঁড়ার মতো ঘটনা ঘটিয়েছে। উচ্চ আদালত বলেছে —The High Court made it clear that "Bangladeshi nationals who have illegally migrated to India or trespassed, have no legal right of any kind to remain in the country and are liable to be deported. The order of deportation is not punishment, but a method of ensuring the return to his own country of an alien who has not complied with conditions."

[The Times of India, August 14, 2008]

> **ফরেনার্স (ট্রাইব্যুনাল) অর্ডার ১৯৬৪ যা সময়ে সময়ে সংশোধন করা হয়েছে তা কেবলমাত্র অসমে প্রযোজ্য** (As reported by The Sentinel on 13 August 08) **। এই আইন অন্য দুটি রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা যেখানে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ব্যাপক পরিমাণে সে দেশীয় সংখ্যালঘুরা এসেছে সেখানে প্রযোজ্য নয়।**

বিজেপি, অগপ, টি জি পি, ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা ও আসুর ছাত্রনেতারা বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী বিতাড়ন ও বহিষ্কারের জন্য আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর করেছে। বিজেপি যুবমোর্চার কর্মীরা দিল্লীতে যন্তর-মন্তরে গিয়ে কেন্দ্র ও অসম রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়েছে। ওই বিক্ষোভে সামিল হয়েছিলেন বিজেপি সভাপতি রাজনাথ সিং স্বয়ং।

মোদ্দা কথা হল, হাইকোর্টের ওই রায়ের পরই পুরো অসমে সর্বসাধারণের মানসিকতা এখন সোজাসুজি দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেছে। একদল, যারা দেশ-সমাজ-রাষ্ট্রের ক্ষতি করেও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের এদেশেই রেখে দিতে চায় আর অন্যদল — যারা ওই বাংলাদেশীদের বিতাড়িত করতে চায়। অসমে মুসলমানদের দুটি সংগঠনের একটি রাজনৈতিক দল এ ইউ ডি এফ (অসম বিধানসভায় ৯ জন বিধায়ক বর্তমান) এবং অন্যটি ছাত্র সংগঠন 'আমসু'। এছাড়া মোল্লা-মৌলবী এবং তাদের দোসর রাজ্য কংগ্রেস ও রাজ্য সরকার। এরা সবাই এক স্বরে কথা বলছে, যারা অসম থেকে বেআইনী বাংলাদেশীদের বিতাড়িত করতে চায় এরা তাদের বিরুদ্ধে মুখর। শুধুমাত্র মুখরই নয়, রীতিমতো বাংলাদেশী বিতাড়ন অভিযানকে মুগুর পেটা করে দাবিয়ে দিতে উঠে পড়ে লেগেছে। আন্দোলনকারীদের তারা বিপথচালিত করার জন্য বলছে — প্রকৃত ভারতীয় মুসলমানদের হ্যারাশ করা হচ্ছে। কট্টরপন্থী মুসলমানরা এরকম অলীক অভিযোগ করে বাংলাদেশীদের চিহ্নিত করতেও বাধা দিচ্ছে। ঠিক একইভাবে পশ্চিমবঙ্গেও মহারাষ্ট্র থেকে আদালতের রায়ে বিতাড়িত বাংলাদেশী মুসলমানদের শাসক দল উলুবেড়িয়া স্টেশনে নামিয়ে ভ্যানিশ করে লুকিয়ে ফেলেছিল।

টেররিজমকে কাউন্টার করতে নিরাপত্তাবাহিনীর হাতে ব্যাপক সংখ্যায় অসমীয়া (হিন্দু) যুবকরা যখন নিগৃহীত, অত্যাচারিত এমনকী নিহত হচ্ছিল, তখন এই বাংলাদেশী মুসলিম প্রেমীরা কিন্তু প্রকৃত ভারতীয়দের হয়রানি করার কথা একবারও মুখ ফুটে বলেনি। চুপ করে ছিল। খবর হল, প্রচুর সংখ্যায় এইসব কট্টরপন্থী মুসলমান যুবকরা উলফা, মুলটা (Muslim united Liberation Tigers of Assam), মুলফা (Muslim united Liberation Front of Assam), ইসলামিক টাইগার ফোর্স প্রভৃতি সংস্থার সদস্য এবং যোগাযোগ রক্ষাকারী কুরিয়ার-এর কাজ করছে। ওইসব সংস্থাই বাংলাদেশ -ভিত্তিক ইসলামি জঙ্গি সংগঠন হুজি বা হরকত উল জিহাদি ইসলামি'র জঙ্গিদের নিম্ন অসমের চর এলাকায় আশ্রয় দিয়ে ঘোরাফেরা করতে সাহায্য করছে। ওই চর এলাকাই আবার বাংলাদেশীদের ঘুরে ফিরে থাকার জায়গা। ওখানে নিরাপত্তা বাহিনী অভিযান চালালেও কোনও জঙ্গির মৃত্যুর খবর নেই। অভিযোগ বলতে শুধু এই — মুসলমানদের হয়রান করা হচ্ছে। অথচ এইসব সেকুলারিস্টরা দু'পক্ষের লড়াইয়ে দশ হাজার অসমীয়া যুবক আর পাঁচ হাজার নিরাপত্তারক্ষী মারা পড়লে কোনও টুঁশব্দও করেনি। হয়ত এরা মুসলমান নন বলেই। আর এদিকে বাংলাদেশীদের প্রায় একশভাগই তো মুসলমান। তাহলে ওই সব সংস্থা বা ব্যক্তিদের বাংলাদেশী বিতাড়ন অভিযানে বাধা দেওয়ার কোনও নৈতিক অধিকার আদৌ রয়েছে কি? আপার অসমে বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুদের সন্দেহজনক নাগরিক বলে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, অথচ তাদের ব্যাপারে কোনও কথা বলা হচ্ছে না। কেন? একথাটা মনে রাখা প্রয়োজন । এমনকী যে স্থানীয় জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলি 'বিদেশী বিতাড়ন' বিষয়ে প্রচার করছেন তাদেরকে বিভিন্ন মুসলমান সংগঠনের পক্ষ থেকে সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে। অসমীয়া মুসলমানদের সংগঠনও সন্দেহজনক বাংলাদেশী (মুসলমান)-দের চিহ্নিতকরণের ব্যাপারে আইন নিজেদের হাতে তুলে না নিতে হুঁশিয়ারি দিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ্য যে আমসু (All Assam Minority Student Union) মুসলমানদের হয়রানি করার বিরুদ্ধে গত ১২ আগস্ট অসম বন্ধ-এর ডাক দিয়েছিল। সে সময় আমসু'র ক্যাডাররা কয়েক জায়গায় হিংসাত্মক ঘটনার উস্কানি দিয়েছে। তেজপুরে হিন্দু বরযাত্রীদলকে আক্রমণও করেছে। পুলিশের জীপ পুড়িয়েছে, জোর-জবরদস্তি করে দোকান বন্ধ করিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে একটি ট্রাককে হারাপুটাতে আগুন লাগিয়েছে। এদিকে বহুল প্রচারিত টাইমস্ অফ্ ইন্ডিয়া গত ১৩ আগস্ট জানিয়েছে — "বেজিং থেকে ফিরেই অসমের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, আইন ভেঙে কাউকেই কোনও বিদেশীকে চিহ্নিত ও বিতাড়িত করা সরকার সহ্য করবে না।" কিন্তু মজার কথা হল, মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু আদৌ বলেননি যে কোন্ আইনের বলে একজন বা একদল ভারতীয় কোনও সন্দেহজনক বিদেশীর পরিচয় ও পরিচিতি খোঁজ করতে পারেন না। পারে না বিদেশীরা যদি সরাসরি জমিতে, বাঁধের পাড়ে, জঙ্গল এলাকায়, রেল লাইনের ধারে, রেলের জমিতে বসতি গড়ে তুললে তার বিরোধিতা করার বা তাকে বিতাড়িত করতে চাওয়ার? কেন মুখ্যমন্ত্রীর মুখবন্ধ যখন আমসুর মস্তানরা 'বাংলাদেশি বিতাড়ন' অভিযানের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক বিরোধিতা করছে? এখন অসম সরকারকে অসমবাসীদের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে যে, রাজ্য সরকার বাংলাদেশী বা অন্য বিদেশীদের (অসমে বসবাসকারী) চিহ্নিত ও বিতাড়িত করার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট। তাদের প্রতি কোনও পক্ষপাতিত্ব নেই। এক্ষেত্রে তরুণ গগৈ সরকার আইন প্রয়োগে বাস্তবিক চেষ্টা করছে কী না এবং জেলা শাসক বা মহকুমা শাসককেও আইন বলবৎ করে বিদেশী বিতাড়নে সচেষ্ট কী না তা দেখাতে হবে। দেখাতে হবে এই রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কাজে স্থানীয় ও ইচ্ছুক মানুষেরও সাহায্য তাঁর প্রশাসন নিচ্ছেন। লাগোয়া রাজ্য মেঘালয়ে কিন্তু সরকারি প্রশাসন, পুলিশ স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিচ্ছেন বিদেশী বাংলাদেশী বিতাড়নে। মেঘালয়ের গারো পাহাড় জেলাতে স্থানীয় প্রশাসন একাজে তৎপর। অসম এবং অসমীয়াদের রক্ষাতে অসমের মুখ্যমন্ত্রী-এ কাজ করতে আগ্রহী কী না সেটা এখন দেখার। আদি অসমীয়া এবং অসমবাসী অন্যান্য ভারতীয়রা আজ জবাব চায় তরুণ গগৈ সরকারের কাছে যে, আমসু (AAMSU) বারবার মুসলমানদের স্বশাসিত এলাকার যে দাবি জানিয়েছে সে ব্যাপারেও। এই একই দাবি এর আগে ধুবড়ির এ ইউ ডি এফ বিধায়কও (মুসলমান ও প্রাক্তন কংগ্রেসী) প্রকাশ্যে সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছিলেন। এ ধরনের কথাবার্তা ভারতীয় সংবিধানের বিরোধী। রাজ্য সরকার এসব লোকেদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, আর যদি না নিয়ে থাকেন তাহলে কেন নেননি? অপরপক্ষে, গুয়াহাটি হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি বি কে শর্মার মন্তব্যের পর পরই মুখ্যমন্ত্রী তড়িঘড়ি বিবৃতি দেন। বলেন, 'ওই বক্তব্য পাশ কাটানো, কোনও সারমর্ম নেই, এমনকী অসমের বর্তমান টাল-মাটাল পরিস্থিতির জন্যও ওই মন্তব্যই নাকি দায়ী।' অথচ গগৈ সচেতনভাবেই জানেন যে, বাংলাদেশীরা অসমে সর্বত্র লুকিয়ে-চুরিয়ে আছে। একথা পুলিশের পক্ষ থেকে বারবার তাঁকে জানানো হয়েছে, এছাড়া ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠকেও বাংলাদেশী প্রসঙ্গ উঠছে। গগৈ-এর সততা ও আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। কেননা আইনের ব্যাখ্যা বা হাইকোর্টের বিচারপতির লিখিত মন্তব্যের জবাব দেওয়ার জন্য তো রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল রয়েছেন। তাহলে গগৈ কেন আগ বাড়িয়ে কথাবার্তা বলে পরোক্ষে বাংলাদেশীদেরই পক্ষ নিচ্ছেন! তাহলে বলতে হবে মুখ্যমন্ত্রী কাম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নজর কেবল মাত্র ভোটব্যাঙ্কের দিকে। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হয়ে হাইকোর্টের বিচারপতির রায় নিয়ে মন্তব্য করাটা বিচারবিভাগের কাজে সরাসরি হস্তক্ষেপ করার মধ্যেই পড়ে। বিচারপতি শর্মার ৯৫ পৃষ্ঠার রায় একটু তলিয়ে দেখে ভাবনাচিন্তা করতে হবে। যেটুকু সংবাদমাধ্যমে এসেছে তা থেকে জানা গেছে — ২০০৫ সালের ১২ জুলাই ভারতের সুপ্রীম কোর্ট এক ঐতিহাসিক রায়ে অসমের বিতর্কিত আই এম (ডি টি) আইন ১৯৮৩ বাতিল করে দেন। মুখ্যমন্ত্রী মন্তব্য করার আগে ওই রায়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ খতিয়ে দেখা উচিৎ ছিল। সেটা চোখ খুলে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট হ'ত। এদেশের একতা ও অখণ্ডতা অবৈধ বাংলাদেশী অভিবাসীদের দ্বারা আক্রান্ত। সম্প্রতি রাজিয়া বেগম নামে জনৈকা বাংলাদেশী মুসলিম মহিলা দিল্লী হাইকোর্টে তার বহিষ্কার আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করেন। বহিষ্কারের আদেশ দিয়েছিলেন ফরেনার্স রেজিস্ট্রেশন অ্যাণ্ড রিপোর্টিং অফিসার। মহিলাটির পরিবারের অন্য পাঁচজনের বিরুদ্ধেও একই আদেশ ছিল। সেই আদেশ বলা হয়েছিল, অনুপ্রবেশের ট্রেণ্ড দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড প্রভাবী। একজন বিদেশী নাগরিক কখনই দেশের আইনকে ফাঁকি দিয়ে সহজেই ভারতীয় হতে পারেন না। হাইকোর্ট পরিষ্কারভাবে বলেছে — "যে সকল বাংলাদেশী ভারতে এসেছে অথবা ভারতভূমিতে অনধিকার প্রবেশ করে এদেশে বসে পড়েছে তাদের এদেশে বসবাস করার কোনও রকম আইনগত অধিকার নেই। তাদেরকে বহিষ্কৃত হতে হবেই। বহিষ্কারের আদেশ কোনও শাস্তি নয়। বরং তাকে তার স্বদেশে ফিরে যেতে বাধ্য করতে হবে এবং কোনও যুক্তি তর্ক দেখিয়ে সে এদেশে থাকতে পারে না।" (টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া-১৪ আগস্ট, ২০০৮)। দিল্লীতে এই মুহূর্তে বাংলাদেশী নাগরিকরা গচ্ছিত ভোটব্যাঙ্ক হয়তো হয়নি বলেই এই রায় নিয়ে রাজনৈতিক কূটকচালি শোনা যায়নি।

*ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া।*

এবার আসা যাক বহিষ্কার প্রসঙ্গে। এটা কীভাবে কার্যকর করা হবে? হয় বাংলাদেশের সঙ্গে আলাদা করে বহিষ্কার চুক্তি করতে হবে অথবা 'পুশব্যাক' পদ্ধতিকে যথোপযুক্ত করতে হবে? 'পুশব্যাক' পদ্ধতি বিষয়ে বি এস এফ-এর সহজাত দুর্বলতা আছে। দেখা গেছে বি এস এফ পুশব্যাক করার পর আবার রাতের অন্ধকারে পাহারাবিহীন সীমান্ত দিয়ে তাদেরকে ভারতে ঢুকিয়ে দেয় বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী বি ডি আর। যদি কোনও বাংলাদেশীকে ভারত থেকে বহিষ্কারের নোটিশ দেওয়া হয় তখন স্থানীয় পুলিশ তাদেরকে বি এস এফ-এর হাতে তুলে দেয়। পরে বি এস এফ-র তাদেরকে বি ডি আর-এর হাতে সঁপে দেওয়ার কথা। বিডিআর তাদেরকে বাংলাদেশী বলে সনাক্ত করতে নিজেদের মতো করে সময় নিয়ে নেয়। তারপর তাদেরকে ফেরৎ নেওয়ার ব্যবস্থা করে। ততদিন অসম পুলিশকে ওই বহিষ্কৃতদের ব্যবস্থা দেখতে হবে। যদি বি ডি আর ফেরৎ নিতে রাজী না হয় তাহলে বি এস এস তাদের কোনও গোপন পদ্ধতিতে 'পুশ-ব্যাক' করে। এই সকল আইনগত বাধ্যবাধকতা সরকারকে সমীক্ষা করেই

*(এরপর ১০ পাতায়)*

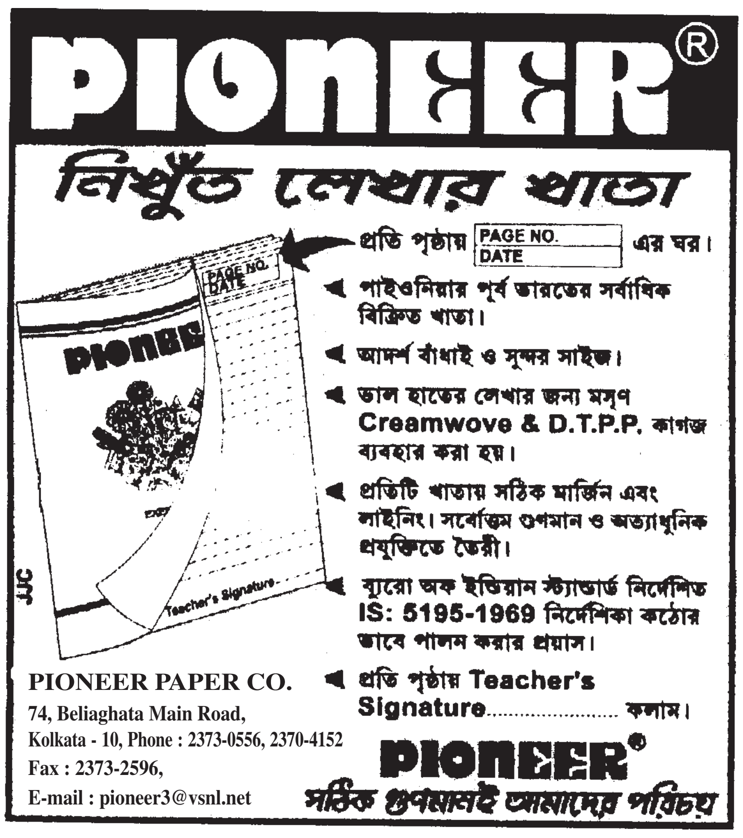

## চিঠিপত্র

# ধারা ৩৭০ ও সর্দার প্যাটেল

দীননাথ মিশ্র তাঁর নিবন্ধে (স্বস্তিকা, ৪।৮।০৮) বলেছেন, গণপরিষদে প্রস্তাবিত ৩৭০ নং ধারার পক্ষে সই না করে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল পদত্যাগ করেছিলেন, এবং সেই পদত্যাগপত্র জাতীয় সংগ্রহশালায় রয়েছে। সংবাদটি অনেকের কাছেই নিঃসন্দেহে অভাবিত। এযাবৎ ওই পদত্যাগের কাহিনী শোনা যায়নি। তাই, বহুবার নাড়াচাড়া করা K.L.Panjabi কৃত 'The Indomitable Sardar' পুস্তকখানি আবার ভাল করে দেখলাম। পুস্তকটিতে গণপরিষদের বিভিন্ন সাব-কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে সর্দার প্যাটেলের দক্ষ নেতৃত্বের কথা আছে, কিন্তু, ৩৭০ নং ধারার প্রতিবাদে তিনি পদত্যাগ করেছিলেন, তেমন কোনও বার্তা নেই। রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'কাশ্মীর মঞ্চে শ্যামাপ্রসাদ' পুস্তকে বলরাজ মাধোকের 'Jammu, Kashmir and Ladakh' গ্রন্থসূত্র উল্লেখ করে জানিয়েছেন, পন্ডিত নেহরুর নির্দেশে গোপালস্বামী আয়েঙ্গার ৩৭০ নং ধারাটি পেশ করেছিলেন। বাবাসাহেব আম্বেডকর ধারাটির তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত, প্রস্তাবিত ধারাটি 'সাময়িক' এবং 'স্বল্পমেয়াদী' বলে শ্রীআয়েঙ্গার বিবৃতি দেওয়ার পর প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল। সর্দার প্যাটেল ওই প্রস্তাবের প্রতিবাদে 'পদত্যাগ' করেছিলেন তেমন কোন সংবাদ সেখানেও নেই।

সর্দার প্যাটেল ১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বর থেকে 'ক্ষমতা হস্তান্তর' পর্বের পূর্ব পর্যন্ত 'অন্তর্বর্তী সরকার'-এর 'হোম' এবং 'তথ্য ও সম্প্রচার' দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য ছিলেন, তারপর আমৃত্যু (১৯৫০ সাল) ভারতের উপপ্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে সর্দার প্যাটেলের কর্মজীবনে কোনও পদত্যাগের ঘটনা ঘটেনি বলেই জানি। যদি তেমন কিছু ঘটে থাকে, সেক্ষেত্রে আশা করব, কোন পদ থেকে কবে সর্দার প্যাটেল পদত্যাগ করেছিলেন সেই বৃত্তান্ত এবং সম্ভব হলে, ঐ পদত্যাগপত্রের বয়ান বিস্তারিত জানিয়ে আমাদের সংশয় নিরসন করবেন।

*বিমলেন্দু ঘোষ, কলকাতা-৬০*

## অনুপ্রবেশকারী ও নির্বাচন কমিশন

ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিন শয়ে শয়ে মানুষ অবৈধভাবে পশ্চিমবাংলা হয়ে ভারতভূমিতে ছড়িয়ে পড়ছে। তারা বাংলাদেশে ফিরে না গিয়ে এ দেশের স্বজাতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিচয় গোপন করে তাদের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে থেকে গিয়ে প্রতিনিয়তএদেশের মুসলিম জনসংখ্যাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে সাহায্য করছে। বৈধ পাসপোর্ট নিয়েও যারা একবার এদেশে আসে ভিসার মেয়াদ শেষ হলেও তারা ভারত ছেড়ে বাংলাদেশে ফিরে যায় না। এদিকে ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলো মুসলিম ভোট পাওয়ার লালসায় সম্প্রীতির রেল যোগাযোগ, বাস যোগাযোগকে যেমন উৎসাহ যোগাচ্ছে তেমনি অবৈধ অনুপ্রবেশকে না দেখার ভান করে। কখনও সহযোগিতা করে, দেশবিরোধী ভূমিকা গ্রহণে তৎপর হয়েছে। এই সার্বিক পথ ধরে দেশের অভ্যন্তরভাগে সংক্রামিত ব্যাধির আকার ক্রমশ দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। ভোটের স্বার্থে দেশের অভ্যন্তরভাগে ঘটে চলেছে অনুপ্রবেশ।

বাংলাদেশীরা সহজে যেমন রেশন কার্ড, ভোটের পরিচয় পত্র পেয়ে এদেশের নাগরিক হয়ে যায় তেমনি দেশীয় মানুষজনের দু'জায়গায় ভোটার লিস্টে নাম ওঠে। অবাঞ্ছিত এই ভোটব্যাঙ্ক যতদিন চালু থাকবে ততদিন ঘরে বাইরে এমন অনুপ্রবেশ ঠেকানো যাবে না। বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ ভোটারের দুজায়গায় ভোটের পরিচয়পত্রটি রাখার ব্যবস্থাটিকে পুরোপুরি বন্ধ করতে না পারলে বিদেশী অনুপ্রবেশকে বন্ধ করা সম্ভব হবে না। এব্যাপারে ভোটদাতাদের ভোটের পরিচয় পত্র ইস্যুর ব্যাপারে নিজ নিজ জন্মস্থানকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। সমগ্রদেশবাসীর জন্ম-মৃত্যুর খতিয়ান রাখা ও জন্ম প্রমাণপত্র ইস্যু করা। দীর্ঘস্থায়ী চাকরির উদ্দেশ্যে কাউকে জন্মস্থান ছেড়ে অন্যত্র থাকতে হলে সেক্ষেত্রে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন জায়গার সে ভোটার থাকতে ইচ্ছুক। নির্বাচন সংক্রান্ত সমূহ কাজের প্রয়োজনে দেশের সর্বত্র থাকবে নিজস্ব অফিস ও অফিসের কাজের জন্য স্থায়ী কর্মচারী, রাজ্য সরকারের কোনও কর্মচারী দিয়ে এই কাজগুলি করা চলবে না।

এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বিদেশীদের অনুপ্রবেশ যেমন বন্ধ হবে তেমনি রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের পথটিও বন্ধ হবে বলে আমার ধারণা।

*মুরারি মোহন মান্না, পূর্ব মেদিনীপুর*

# প্রসঙ্গ অনুপ্রবেশ

**দিলীপ কুমার বিশ্বাস**

কদিন আগে গুয়াহাটি হাইকোর্টের জাস্টিস বি কে শর্মার ৯৫ পাতার এক রায় থেকে জানা গেছে, মহম্মদ কমরুদ্দিন নামে এক পাকিস্তানী নাগরিক পাকিস্তানের পাশপোর্ট নিয়ে ঢাকায় আসে এবং বাংলাদেশ থেকে সে অনায়াসে ভারতে ঢোকে ও সারা ভারতবর্ষে বাধাহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়। পরবর্তী কালে ১৯৯৬ সালে অসমের যমুনামুখ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ভোটে দাঁড়ায়। এই ঘটনাটা ইউরোপের কোনও দেশে হলে হৈ চৈ পড়ে যেত, কিন্তু আমাদের দেশে বিদেশী অনুপ্রবেশ একটা নিত্য ঘটনা।

বিভিন্ন রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে এটা বোঝা যায় যে, এই মুহূর্তে ভারতে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা কমপক্ষে সাড়ে তিন কোটি। এসবই ঘটছে রাজনৈতিক শয়তানীর জন্য। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলি যেমন অসম, পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরার রাজ্য সরকার ও শাসক দলগুলির মদতেই যে এরা প্রবেশ করছে এটা সবাই জানে। কিন্তু সাধারণ মানুষের করার কিছু নেই। প্রতিবাদ করতে গেলে ক্যাডার-দল, পুলিশ বাহিনী প্রতিবাদীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। বিদেশীদের তাড়ানোর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারও নপুংসকের ভূমিকায়। ভাবখানা এমন যেন বিদেশী অনুপ্রবেশকারীদের গায়ে হাত দিলেই দেশে দাঙ্গা বেধে যাবে।

কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক নিয়ে যুদ্ধ করার হিম্মৎ আছে কিন্তু অনুপ্রবেশকারীদের হটানোর হিম্মৎ নেই। সাড়ে তিন কোটি বিদেশী যদি আমাদের সংগতিতে চিরস্থায়ী ভাগীদার হয়, দেশের দুর্দশা তো কোনদিনও কাটবে না। পঙ্গপালরা তো আগামী দশ বছরে ছলা-পোনায় দেশটার অন্তর্জলি যাত্রার ব্যবস্থা পাকা করে দেবে। এক জিয়াগঞ্জেই ৫০ হাজার অনুপ্রবেশকারীর সন্ধান পাওয়া গেছে। সীমান্তের যে কোনও অঞ্চলে গিয়ে সমস্যা অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে ওই সব অঞ্চলের জনচরিত্র ইতিমধ্যেই কী রকম বদলে গেছে।

মহম্মদ কমরুদ্দিনের কেসের রায় দিতে গিয়ে বিচারপতি বি কে শর্মা বলেছেন যদি বেআইনি অনুপ্রবেশ বন্ধ না করা হয় তাহলে সেদিন আসতে আর দেরি নেই যখন বিদেশীরাই এদেশে প্রকৃত নাগরিকদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করবে, তখন আমরা যাব কোথায়?

## জনমত

এইসব অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে আসলে চলছে ভোটের রাজনীতি। অনুপ্রবেশ আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে যখন এই দেশেরই পাকিস্তানপন্থী ও বাংলাদেশীরা এই সবের পেছনে এসে দাঁড়ায় ও তার প্রতিফলন হয় ভোট ব্যাঙ্কে। আর ভোট ব্যাঙ্ক ঠিক রাখতেই ক্ষমতায় আসীন শকুনি মামারা এমন এমন কথা বলেন যা শুনলে বুনো জানোয়াররাও ধিক্কার দেবে। একালের এই সব শকুনি মামারা অবশ্য গান্ধার থেকে আসেননি এসেছেন পূর্ব বাংলা থেকে গুঁতো খেয়ে। এঁদেরই একজন ক্ষমতায় থাকাকালীন বলেই বসলেন — "কে অনুপ্রবেশকারী আর কে ভারতীয় নাগরিক চিনব কী করে? এক ভাষা, একরকম দেখতে — তাহলে?" ওই মামা এখন নখদন্তহীন তাই ওঁর প্রসঙ্গে আর না যাওয়াই ভালো।

আর এক শকুনি মামা যিনি বড় রগ চটা ও তেমনি মোটা মাথা এবং একগুঁয়ে। উনি এইসব বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের ও তাদের এদেশী সহযোগীদের নামে কেউ কিছু বল্লেই বলেন, "চুপ, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেব।"

অনুপ্রবেশকারীরা এদেশের রাজনৈতিক দলগুলির মদতে এবং প্রো-পাকিস্তানী ও প্রো-বাংলাদেশীদের আশ্রয়ে বলীয়ান হয়ে অসম, মেঘালয়, মিজোরাম, ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের অংশ নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধ পরিকর। এ সবই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের জানা। এইসব অনুপ্রবেশকারীদের একটা বড় অংশ আসে বৃহত্তর মতলবে। এদের পেছনে আছে পাক সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী আই এস আই ও বাংলাদেশের গুপ্তচর সংস্থা ডি জি এফ আই। লক্ষ্য ভারতবর্ষে নাশকতা ও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জাল ছড়ানো। 'অপারেশন টোপাজ' ও 'অপারেশন পিন কোড' নাম দিয়ে আই এস আই ভারত বিরোধী গোপন অভিযান আজও চালু রেখেছে। আজ সীমান্ত রাজ্যগুলোতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মূল কারণ সাড়ে তিন কোটি বিদেশী অনুপ্রবেশকারীদের উপস্থিতি। তারা কী আমাদের খাবার খেয়ে নিচ্ছে না?

ভারত ও ভারতের মানুষের সামনে আসছে ঘোর দুর্দিন। এইভাবে অনুপ্রবেশ চলতে থাকলে এদেশের জনচরিত্র বদলে যাবে, ফলে এদেশটা একদিন পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মতো এক মৌলবাদী রাষ্ট্রে পরিণত হবে। সেদিন সেকুলারিস্টরাই বা কোথায় যাবেন? রাজনৈতিক দলগুলি কী তাদের আশু স্বার্থ ভোট ব্যাঙ্কের দিকে না তাকিয়ে দেশের দিকে একবার তাকাবেন?

# হারাতে মরিয়া টি আর এস

*(৭ পাতার পর)*

কমিউনিস্টদের তথা তথাকথিত তৃতীয় ফ্রন্ট ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। যদিও এই রাজ্যে তৃতীয় ফ্রন্টের অস্তিত্ব স্রেফ কাগজে কলমের বাইরে কিছু নেই।

এখনই অন্তত একটা বিষয় পরিষ্কার। তাহল, টি আর এস যে কোনও মূল্যে কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করতে বদ্ধ পরিকর। কারণ কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস রাজশেখর রেড্ডির তেলেঙ্গানা রাজ্য সম্পর্কে চরম 'বিশ্বাসঘাতকতা'। চিরঞ্জীবীরও লক্ষ্য কংগ্রেসকে শিকড় সমেত উপড়ে ফেলা। এক্ষেত্রে টি ডি পি যদি এদের সঙ্গে না আসে তাহলে তারা যে একঘরে হয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। মুখ্যত এসব দিক পর্যালোচনা করেই যে চন্দ্রবাবুর দল তাদের পরিষদীয় বৈঠকে টি আর এসের সঙ্গে জোট বাধার ব্যাপারে জোর দিয়েছে সেকথা এক প্রকার বলাই বাহুল্য।

# ফ্রন্টে দ্বন্দ্ব

*(৫ পাতার পর)*

সিপিএম-এর বিরোধীরা আরও নিম্নস্তরের কথা বলছে— "সিপিএম থু থু ফেলে আবার থু থু চেটে নিল।" সিপিএম-এর মেদিনীপুর জেলা কমিটি সিঙ্গুর চুক্তির বিরুদ্ধে।

সিঙ্গুর চুক্তি নিয়ে বামফ্রন্টের শরিক দলগুলির মধ্যে বিশেষ করে সিপিআই, আর এস পি বুদ্ধবাবুর মীমাংসা করার মনোভাবের পক্ষে আছেন। তাঁরা নিরুপম সেন-কে সমালোচনা করে বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীকে অপমানজনক অবস্থার ফেলার জন্য তিনি টাটাদের হয়ে ওকালতি করছেন।

শরিকদের কেউ কেউ বলছেন, নিরুপম সেন কে, যিনি মুখ্যমন্ত্রীর চুক্তি বাতিল করছেন? যদিও শরিকদের কোনও কোনও সদস্য মনে করেন চুক্তিটির কারণ খুব দুর্বল এবং দু'রকম অর্থ করা যায়। এখন দেখা যাচ্ছে — শুধু সিপিএম দলেই নয় — বামফ্রন্টের মধ্যেও সিঙ্গুর চুক্তি নিয়ে বেশ বিভ্রান্তি ও দ্বিমত দেখা যাচ্ছে। মমতার ধারণা বামফ্রন্টে ঐক্য এনে দিয়েছিল। চুক্তি আবার ঐক্য ভেঙে অনৈক্য করে দিল। ভবিষ্যতে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম সিপিএম-এর মৃত্যুবাণ না হয়।

# বহিষ্কার শাস্তি নয়, প্রক্রিয়া মাত্র

*(৯ পাতার পর)*

চিহ্নিত অবৈধ অভিবাসীদের বহিষ্কারের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ফরেনার্স (ট্রাইব্যুনাল) অর্ডার ১৯৬৪ যা সময়ে সময়ে সংশোধন করা হয়েছে তা কেবলমাত্র অসমে প্রযোজ্য (As reported by The Sentinel on 13 August, 08)। এই আইন অন্য দুটি রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা যেখানে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ব্যাপক পরিমাণে সে দেশীয় সংখ্যালঘুরা এসেছে সেখানে প্রযোজ্য নয়।

ফরেনার্স অ্যাক্ট, ১৯৪৬-এর সেকশন (৩জি) ধারায় স্পষ্টভাবে বলা আছে, যদি কোনও বিদেশী ভারতে ঢুকে তাহলে তৎক্ষণাৎ তাকে গ্রেপ্তার করে আটক করা হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ফরেনার্স ট্রাইবুন্যাল দ্বারা তার সনাক্তকরণ হয় ততক্ষণ তাকে আটক রাখা হবে। ১৯৬৪ সালের বিদেশী আইন (যা অসমে প্রযোজ্য)-এ সন্দিগ্ধ বিদেশীদের সনাক্তকরণ পর্যন্ত আটক রাখার কোনও সংস্থানই নেই। এখানেই যাবতীয় ফারাক বা গলদ বর্তমান। এখন কেন্দ্র ও অসম সরকার কী আন্তরিকতার সঙ্গে ওই ফাঁক পূরণ করার চেষ্টা করবেন? অথবা সারা দেশের সঙ্গে একত্রে সাধারণ ভাবে ১৯৪৬ সালের আইন প্রয়োগ যাতে হয় তার ব্যবস্থা করবেন?

*লেখক অসম সরকারের প্রাক্তন মুখ্যসচিব। - দি সেন্টিনেল-এর সৌজন্যে*

# বাজারে এল বৈশাখী-লিনাক্স সফ্‌টওয়ার

**সংবাদদাতা ।।** একটি সংস্থা এবং একটি বাংলা সফ্‌টওয়ার-এর একত্রে একই অনুষ্ঠানে উদ্বোধন হল গত ৮ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র সদন আকাদেমি সভাঘরে। উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী দেবেশ দাস।

নবজাত সংস্থাটির নাম ভাষা প্রযুক্তি গবেষণা পরিষদ। এদিন যে বাংলা সফ্‌টওয়ারটির উদ্বোধন হল তার নাম বৈশাখী লিনাক্স। বৈশাখী-তে আলাদাভাবে উইন্ডো-র দরকার পড়ে না, এরই মধ্যে রয়েছে ওয়ার্ড ও এক্সেল। বৈশাখী এবং বৈশাখী ইনস্ক্রিপ্ট কীবোর্ড-লে-আউট। বৈশাখী নববৈশাখের হাওয়ায় কম্পিউটার জানা ও না-জানার ভেদাভেদ মুছে দেবে বলে উদ্যোক্তাদের দাবি। বৈশাখী লিনাক্স ১.০ এর মূল নির্মাতা হল সল্ট লেকের সেক্টর ৫-এর জাপানী সংস্থা MAT ও Impex -এর সফ্‌টওয়ার বিশেষজ্ঞ একদল তরুণ বঙ্গ সন্তান। পরামর্শ দিয়ে সাম্মানিক ডিরেক্টর-এর ভূমিকা পালন করেছেন খড়্গপুর আই আই টি-র অধ্যাপক অনুপম বসু। এবং অন্যান্য কয়েকটি সংস্থা।

সম্ভবত জাপানই প্রথম মাইক্রোসফ্‌ট উইন্ডোজ-এর সকল কম্যাণ্ড জাপানী ভাষাতে শুরু করেছিল। ম্যাট্রিই ইমপেক্স-এর কর্ণধার শ্রীমতি মাসামি ওকানোও অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষায় বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, বাংলা ভাষা শিক্ষার উন্নয়ণে কিছু করে তিনি নিজে ধন্য। এই সফ্‌টওয়ার সরাসরি www.nlrt.org ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোডও করা যাবে বিনামূল্যে।

পরম্পরা

## আকুই গ্রামের ঐতিহ্য

# চতুর্ভুজা দেবী আরাধনা

**সোমনাথ নন্দী**

দুর্গাপূজা তথা দুর্গোৎসব বাঙালীর উৎসব সংস্কৃতির নিজস্ব প্রতীক। বিশ্বায়নের পরিভাষায় বিশেষ ব্র্যান্ড। বাঙালী আর দুর্গাপুজো সারা বিশ্বে আজ সমার্থক। দুর্গোৎসব একসময় ছিল নির্মল আনন্দের দ্যোতক। যে বন্দনায় জেগে উঠত অনাবিল প্রার্থনা — দাঁড়াও গো মা হৃদকমলে / পূজি মানস কুসুম তুলি / ভক্তিচন্দন মাখাইয়া পদে দিব অঞ্জলি। ভাব প্রাচুর্যে টইটম্বুর থাকত পূজার অঙ্গন। বর্ষে বর্ষে ফিরে আসা এই উৎসবে বাঙালী খুঁজে পেত নিজ সত্তাকে, আপন স্বজাত্যবোধকে। আর এখন! শুধুই বাহ্যাড়ম্বর। দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে বঙ্গ জীবনের মরা গাঙে বান আসে বটে, আনন্দ-স্ফূর্তি-উল্লাসে দুলে ওঠে বাঙালির হিয়া। কিন্তু সে আনন্দের মধ্যে থাকে মরচে ধরা মানসিকতা, জৈবিক উল্লাস, মননশীলতার মৃতবৎ আচরণ। থাকে না শান্তির সুষমা। কিছু মিডিয়ার কল্যাণে বাঙলার বর্তমান প্রজন্ম দুর্গোৎসব বলতে বোঝে থিমের রমরমা, চটকদার প্যান্ডেল, আলোক সজ্জার চোখ ধাঁধানি জৌলুস আর পেরেক, সুতো, ভাঁড়, আগাছা, নারকেল ছোবড়া ইত্যাদি বর্জ্য পদার্থ দিয়ে গড়া প্যাণ্ডেল প্রতিমা। অন্তঃসারশূন্য ভাবনার দাপটে দুর্গাপূজা থুড়ি শারদোৎসবের অঙ্গে দগদগে ঘায়ের মতো ফুটে উঠেছে চিন্তার দৈন্য, বিকৃত বোধশক্তি ও কৃষ্টি বিপর্যয়ের বার্তা। আসলে উৎসবের রাশ চলে গেছে কিছু উদ্ধত, নিম্নরুচি, বিচারবুদ্ধিহীন, বিকৃত মানসিকতাগ্রস্ত মানুষের হাতে। এই আসুরিক মনোভাবের মানুষরাই এখন উৎসবের নিয়ামক তথা পরিচালক। আর এদের উৎসাহের চুল্লিতে বাতাস জোগাচ্ছে কিছু অপরিণামদর্শী বাণিজ্যিক সংস্থার আহাম্মকি পুরস্কার। অনেকের ধারণা এরাই বাঙলার ঐহিত্যময় উৎসবটির অন্তর্জলি যাত্রাকে এগিয়ে আনছে। হতাশার কোনও কারণ নেই। এখনও বাঙলায় বহু স্থানে বহু পরিবারে কয়েক শতাব্দী ধরে নানা সমস্যার মধ্যে টিকে আছে মাতৃ আরাধনার প্রকৃত ভাবনা, প্রকৃত ঐতিহ্য ও অনাবিল আত্মনিবেদন। বাঁকুড়া জেলায় আকুই গ্রামের পূজা এমনই একটি দৃষ্টান্ত। আকুই গ্রাম বাঁকুড়ায় ইন্দাস থানায় অন্তর্গত একটি গ্রামীণ জনপদ। বর্ধমানের কোল ঘেঁষা দামোদরের দক্ষিণে ১৮ কিলোমিটার ভিতরে। একসময় জায়গাটা ছিল অত্যন্ত দুর্গম। যাতায়াত ছিল সমস্যাসঙ্কুল। বৈষ্ণব প্রধান গ্রামটির বৈশিষ্ট্য হল রাধাকান্তের অপূর্ব নয়ন ভোলানো পঞ্চ রত্ন মন্দির। মন্দিরের নির্মাতা পরম বৈষ্ণব কালুরাম রায়। তাঁরই উৎসাহে গ্রামে

পালিত হত নানা ধরনের বৈষ্ণবীয় উৎসব। তবে দুর্গাপুজোর শুরুটা একেবারে আকস্মিক। পুজোর বয়স বর্তমানে ২৪০ বছর পেরিয়ে গেছে। শুরু ১৭৬৫ সালে। পুজোর কিছুকাল আগে কালুরামের পুত্রদের ইচ্ছা হল দুর্গাপুজো করার। সমস্যায় পড়লেন কালুরাম। শরণাপন্ন হলেন বৃন্দাবনের গোস্বামী প্রভুদের। তাঁরা বিধান দিলেন চতুর্ভুজা কাত্যায়ণী মূর্তি পূজার। সেটাই বৈষ্ণবরীতি।

গোস্বামী প্রভুরা কালুরামকে যে বিধান দিয়েছিলেন তা শাস্ত্রসম্মত। দেবী ভাগবতে (৮।৮।৩৩-৪৩) দেখা যায় দেবতাদের তেজ হতে যে নারীমূর্তি আবির্ভূত হয়, তিনিই জগজ্জননী দুর্গা। বামনপুরাণ (১৮।৫-৮) মতে উক্ততেজ ঘনীভূত হয়ে রূপ নেয় অপরূপা নারীমূর্তির ঋষি কাত্যায়নের আশ্রমে। তাই নাম হয় কাত্যায়নী। মহিষাসুর নিধনের জন্যই তাঁর আবির্ভাব। কালিকাপুরাণের ৬৩ অধ্যায়ের ৭৬-৭৭ শ্লোকে অনুরূপ সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে সেই তেজ (দেবতাদের মিলিত তেজ) কাত্যায়নের দ্বারা কায়া লাভ করেছিল। পরে সেই জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী দেবী মহিষাসুরকে বধ করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতি খন্ডে (৫৭।২১) দেবীকে বলা হয়েছে বিষ্ণুভক্তা, বিষ্ণুরূপা, বিষ্ণো শক্তিস্বরূপিণী — সৃষ্টৌ চ বিযুণ্না সৃষ্টা বৈষ্ণবী তেন কীর্তিতা। বিষ্ণু-স্বরূপিনী বলেই তিনি বিষ্ণু চিহ্ন অর্থাৎ শঙ্খ-চক্র-গদা চক্রধারিণী। স্কন্দপুরাণের কাশীখন্ডে (উত্তরার্ধ ৭২।৩৮) উক্ত রূপের সমর্থন পাওয়া যায়।

কালুরাম ১৭৬৫ সালে যে মূর্তির আরাধনা করেছিলেন, তা ওই কাত্যায়নী দুর্গামূর্তি। দেবী চতুর্ভুজা। তার হাতে শঙ্খ, চক্র, গঙ্গা, পদ্ম। প্রস্ফুটিতে পদ্মের উপর দন্ডায়মানা। দুদিকে চিরাচরিত ভাবে লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ, অনুপস্থিত কেবল বাহন সিংহ ও দানবাধিপতি মহিষাসুর। আকুই গ্রামে চতুর্ভুজা দেবীর আরাধনায় অনুসরণ করা হয় বৈষ্ণবীয় বিধি। সব ধরনের বলি নিষিদ্ধ । সন্ধিপূজার মুহূর্তে দেবীকে চামুন্ডা রূপে আহ্বান করা হয়। পুরোহিতের কন্ঠ থেকে নির্গত হয় চামুন্ডার চিরাচরিত ধ্যানমন্ত্র। তারপর অসুর নিধনের সময় পেরোলে দেবীকে পরানো হয় ১০৮ তুলসীর মালা। বেজে ওঠে খোল, করতাল। ভক্তরা সমস্বরে দেন হরিধবনি।

নবমীর হোম শেষে ভক্তরা শুরু করেন সমস্বরে হরিনাম। বিশেষ আর একটি বৈষ্ণবীয় পদ ভক্তরা গেয়ে থাকেন — বৃন্দাবন বিলাসিনী কৃষ্ণপ্রিয়া রাই আমাদের। কীর্তনের তালে তালে শুরু হয় অনুপম নৃত্য। তখনই দেবীর রূপাভাসে দেখা যায় তাঁর ধ্যানমন্ত্রের উদ্দীপন — শঙ্খচক্র গদাশার্ঙ্গ গৃহীত পরমায়ুধে / প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণী নমোহস্তুতে। আর এই ধ্যানমন্ত্রই আকুই গ্রামে বৈষ্ণবী দুর্গাপূজার অঞ্জলির মন্ত্র।

---

# ভারতীয় উপাখ্যান কি শুধুই আষাঢ়ে গল্প ?

**কমলবিকাশ ব্যানার্জী**

ছোটবেলা মা-ঠাকুমার কাছে ভারতীয় উপাখ্যানের গল্প শুনেছি। শুনেছি অগস্ত্য-বাতাপির উপাখ্যান। এই সব গল্প শুনতে তখন মজাই লাগতো। একটু বড় হলে অনেকের কাছে শুনেছি এগুলো সব আষাঢ়ে গল্প। সত্যিই কি তাই? আপাত দৃষ্টিতে সেগুলি আষাঢ়ে গল্প বলেই মনে হয়। তবে একটু খুঁটিয়ে দেখলে সেগুলিই হয়ে উঠবে জ্ঞানের ভাণ্ডার। প্রাচীন গ্রন্থে এরকম নানা কাহিনীর উল্লেখ আছে। মহাভারতে বর্ণিত বাতাপি বধের কাহিনীর পিছনে আছে মহাকাশের উজ্জ্বল অনুজ্জ্বল নক্ষত্রগুলির জ্যোতিবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য।

ঋগ্বেদে বলা আছে অগস্ত্য মিত্রা বরুণের পুত্র। সূর্যের দক্ষিণায়ন শুরু হবার দিন তাঁর জন্ম। তিনি ছিলেন একজন ঋষি। অবিবাহিত। সাধন ভজন নিয়েই দিন কাটে। বিবাহের কথা কোনও দিন ভাবেননি। বনে বনে ঘুরে বেড়ান। ফলমূল আহার করেন। এই ভাবেই তাঁর দিন কেটে যাচ্ছিল। একদিন বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে শুনতে পেলেন কারা যেন কাঁদছেন। যেদিক থেকে কান্না ভেসে আসছিল তিনি দ্রুত সেদিকে গেলেন। দেখলেন একটি গর্তের মধ্যে কিছু লোক পড়ে আছেন, তাঁরাই কাঁদছেন। অগস্ত্য তাঁদের কাছে কান্নার কারণ জানতে চাইলেন। অগস্ত্যকে দেখে তাঁরা জোরে কাঁদতে শুরু করলেন। ঋষি তাঁদের অভয় দিয়ে বললেন, কাঁদবেন না, বলুন আমি আপনাদের কী সাহায্য করতে পারি। একথা শুনে তাঁরা অগস্ত্যকে বললেন, আমরা তোমার পূর্বপুরুষ। আমাদের এই দুর্গতির জন্য তুমিই দায়ী। একথা শুনে অগস্ত্য মনে খুব ব্যথা পেলেন। জ্ঞানত তিনি কোনও অন্যায় কাজ করেছেন বলে জানা নেই। তিনি হাত জোড় করে জানতে চাইলেন তাঁর কী অপরাধ যার জন্য পিতৃব্যদের এই দুর্গতি? তাঁরা তখন সমস্বরে বলে উঠলেন যে অগস্ত্য অবিবাহিত থাকায় তাঁদের বংশ রক্ষা হবার সম্ভাবনা নেই। তাই তাঁদের এই দুর্গতি। ভেবেছিলেন সংসারে আবদ্ধ হবেন না। জীবনটা এই ভাবেই কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু তাহলে তো পিতৃব্যদের এই দুরবস্থার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না। তাই তিনি বিবাহ করে বংশ রক্ষা করতে মনস্থির করলেন।

পিতৃব্যদের আশীর্বাদ নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধানে। ঘুরতে ঘুরতে তিনি বিদর্ভ রাজ্যে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে এসে রাজকন্যা লোপামুদ্রার সঙ্গে তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। এরপর তিনি গঙ্গাতীরে আশ্রম বানিয়ে নবপরিণীতা স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস শুরু করেন। একদিন তিনি স্ত্রীকে তাঁর পূর্বপুরুষদের দুর্দশার কথা জানিয়ে বললেন, তাঁর গর্ভে সন্তান উৎপাদন করে তিনি বংশ রক্ষা করতে চান। একথা শুনে লোপামুদ্রা বিনয়ের সঙ্গে অগস্ত্যকে বললেন যে, সন্তান প্রতিপালনের জন্য অর্থের প্রয়োজন। অর্থের সংস্থান না করে একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে সন্তান পালন করা কি সম্ভব?

লোপামুদ্রার অকাট্য যুক্তি খণ্ডন করতে না পরে অগস্ত্য অর্থের সন্ধানে বের হলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি উপস্থিত হলেন দৈত্যপুরী মণি মতিপুরে। এখানে বাস করত ইল্বল নামে এক দৈত্য ও তার ভাই বাতাপি। বাতাপি মায়া বলে ছাগরূপ ধারণ করতে পারত। ব্রাহ্মণদের প্রতি ইল্বলের প্রচণ্ড রাগ ছিল। তাই কোনও ব্রাহ্মণ তার কাছে এলে তাঁকে আপ্যায়ণ করার জন্য সে মায়া বলে রূপান্তরিত বাতাপির মাংস রান্না করে ভোজনের আয়োজন করত। আহারের পর ব্রাহ্মণ যখন বিশ্রাম করতেন তখন ইল্বল মায়াবলে মৃত ছাগকে জীবিত করে ভাইয়ের নাম ধরে আস্তে আস্তে ডাকত। সেই ডাক শুনে বাতাপি ব্রাহ্মণের পেট চিরে বেরিয়ে আসত। ইল্বল এইভাবে ব্রাহ্মণ হত্যা করত। অগস্ত্যর ক্ষেত্রেও ইল্বল একই পন্থা অনুসরণ করে। কিন্তু অগস্ত্য ছাগ মাংস হজম করে ফেলায় ইল্বল বাতাপিকে অগস্ত্যের শরীর থেকে বের করে আনতে পারল না। এতে ইল্বল ভয় পেয়ে গেল। অগস্ত্যকে সন্তুষ্ট করার জন্য সে তখন প্রচুর ধনরত্ন তাঁকে দিল। সেই ধনসম্পদ নিয়ে অগস্ত্য লোপামুদ্রার কাছে ফিরে এলেন এবং পুত্র সন্তান লাভ করে সুখে বাস করতে লাগলেন।

এত গেল পুরাণের কথা। জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাথে এর কি সম্পর্ক আছে। সেটা খুঁজে দেখাই আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আগেই বলেছি অগস্ত্য ছিলেন মিত্রাবরুণের পুত্র। কারা এই মিত্রাবরুণ? এরা হল দুই আদিত্য। সূর্যের যে শক্তি ঋতু পরিবর্তনের কারণ, তাকেই বলা হয় আদিত্য। মিত্রা হল গ্রীষ্ম ঋতুর আদিত্যের নাম আর বরুণ হল বর্ষা ঋতুর আদিত্য। এরা যে সময় মিলিত হয় সেই সময় এদের বলা হয় মিত্রাবরুণ। তাই মিত্রাবরুণ হল গ্রীষ্মের শেষ ও বর্ষার শুরুর সন্ধিক্ষণ। এই দিনটি হল ২২ জুন অর্থাৎ, সূর্যের দক্ষিণায়ন শুরুর দিন। তাই অগস্ত্যর জন্মদিন বলা যেতে পারে ২২ জুন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতে অগস্ত্যর বাস মনুষ্যলোকে নয়, মহাকাশে। দক্ষিণ আকাশের কেরিনা মণ্ডলে অবস্থিত উজ্জ্বল, স্নিগ্ধ একটি তারার নাম অগস্ত্য — পাশ্চাত্যে নাম কেনোপাস। অগস্ত্যর খুব কাছেই একটি তারা আছে যাকে অগস্ত্যর পত্নী লোপামুদ্রা হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। 'লোপামুদ্রা' শব্দের অর্থ যিনি স্ত্রীলোকের রূপাভিমান ম্লান বা লুপ্ত করে হর্ষোৎপাদনে সমর্থা। ঔজ্জ্বল্যের বিচারে লোপামুদ্রা একটি পঞ্চ ম মাত্রার তারা। তাই এটি ম্লান উজ্জ্বল্যবিশিষ্ট। সেদিক থেকে এই তারাটির লোপামুদ্রা নামকরণ অযৌক্তিক নয়।

মহাভারতে আছে, বিবাহের পর অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাতীরে এসে বসবাস শুরু করেন। এখানে গঙ্গা বলতে বোঝানো হয়েছে মহাকাশের উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব বরাবর বিস্তৃত আকাশের ছায়াপথকে। ছায়াপথের আরেক নাম 'আকাশগঙ্গা'। দক্ষিণ আকাশের মেরু অঞ্চলে আকাশগঙ্গার পার্শ্বভাগে অগস্ত্য ও লোপামুদ্রার অবস্থান। তাই উপাখ্যানে বর্ণিত পত্নীর সঙ্গে অগস্ত্যর গঙ্গাতীরে বসবাস উক্তিটি অসংগত নয়।

মহাকাশে ইল্বল ও বাতাপির অবস্থান খুঁজতে হলে আমাদের যেতে হবে কালপুরুষ নক্ষত্রে। মৃগশিরার শিরঘু পঞ্চ তারকাটি 'ইল্বলঃ'। এই তারাগুলিকে দেখা যায় কালপুরুষের কটি দেশে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে কালপুরুষকে মৃগ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। স্বয়ং প্রজাপতি 'ঋশ্য' নামে যে ছাগস্বরূপ ধারণ করেছিলেন তাই হল এই মৃগ নক্ষত্র। প্রায় চার হাজার খৃষ্টপূর্বাব্দে কালপুরুষ নক্ষত্র ছিল মহাবিষুবদিনে। এই সময় ঝড় বৃষ্টির সূচনা। রাত্রি ও দিন থাকে সমান। এর ঠিক পাঁচ মাস পরে শুরু হয় শরৎকাল। সূর্য তখন থাকে দক্ষিণায়নের পথে। আর তখনই দক্ষিণ আকাশে দেখা দেয় অগস্ত্য তারা। এই সময় রাতের অন্ধকারে দক্ষিণ আকাশে কালপুরুষ মণ্ডলও উদয় হয়। তাই পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে ইল্বল, বাতাপি ও অগস্ত্যর এক সাথে অবস্থান অবান্তর নয়। এছাড়াও এই সময় মধ্যপ্রদেশে অর্থাৎ বিদর্ভ থেকে অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা তারাদ্বয়কে পরিষ্কার দেখা যায়। মনে হয়, পৌরাণিক উপাখ্যানে বিদর্ভ রাজকন্যা লোপামুদ্রার সঙ্গে অগস্ত্যর পরিণয়ের কাহিনীর উৎপত্তি এখান থেকেই।

শরৎ ঋতুর আগমনের ফলে বর্ষার বিদায় অর্থাৎ, অগস্ত্যর আবির্ভাবের সাথে সাথে ঝড়, ঝঞ্ঝা বা বাত্যার অবসান। ঋগ্বেদে 'বাত' কথার অর্থ 'ঘূর্ণিঝড়'। সুতরাং জ্যোতির্বিদরা বোঝাতে চেয়েছিলেন যে অগস্ত্যর উদয়ের সাথে বর্ষাকাল শেষ। তাই অগস্ত্য তারাকে ঋতুনির্দেশক তারা বললে অত্যুক্তি হবে না।

রূপক আকারে লেখা হলেও ভারতীয় উপাখ্যান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের এই আশ্চর্য

*(এরপর ১২ পাতায়)*

## যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক **দীপেন সেনগুপ্তের** তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

**স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,**

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ **যৌগিক নার্সিংহোম** (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

# শারোদৎসবে কেনাকাটায় রদ-বদল

**ইন্দিরা রায়**

সারা বছরের ব্যস্ততার মধ্যে প্রকৃতির নিয়মে শরৎ ঋতুতে ফিরে আসে শারদীয়া পুজোর হাতছানি। ইদানিং প্রকৃতিতেও খুবই খাম-খেয়ালিপনা দেখা যায়। তবুও কিন্তু শরৎ আকাশে মেঘ থাকলেও তাঁরই ফাঁকে উজ্জ্বল রোদ্দুর জানান দেয় দেবী মায়ের আগমনবার্তা। সেইসঙ্গে মা-বোনেদের নতুন জামাকাপড় কেনার প্রস্তুতি চলে। অনাদিকাল থেকেই বাঙালির দুর্গাপুজোয় প্রতিটি বাঙালি সন্তান সে যে শ্রেণীরই হোক, একটি নতুন পোশাক পরার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। পরিবারগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রাচীন কলকাতার বনেদি অভিজাত পরিবারে মহিলাদের কেনাকাটার ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম।

বনেদি পরিবারগুলিতে অন্দরমহলে ছিল বাড়ির বউ-মেয়েদের বাস। দোকানে গিয়ে নিজের পছন্দ অনুযায়ী কেনাকাটা করা তাঁরা ভাবতেও পারতেন না। বাড়িতেই বসে যেত কেনাকাটার হাট। বাড়ির কর্তার হুকুম অনুযায়ী মহালয়ার বেশ কিছুদিন আগে থেকে আসতে শুরু করত তাঁতি, দর্জি, হরেকরকম মনোহারি জিনিস, আলতা-সিঁদুর নিয়ে ফেরিওয়ালা আর নাপতানি আসত পুজোর ক'দিন আগে মা-বউদের আলতা পরাতে। নির্দিষ্ট দিনে কেনাকাটার হাটে অন্দরমহলের মেয়ে-বউরা নেমে এসে পছন্দমতো শাড়ি বেছে নিত আনন্দভরে।

কিন্তু আজকের ছবিটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। অন্দরমহল থেকে বাইরে এসে আজকের নারী স্বাধীন। আজকের দিনে বেশিরভাগ মহিলা কর্মরত যে কোনও ভাবে। যারা গৃহস্থালি কাজেই শুধু যুক্ত

অঙ্গনা

তারাও স্ব-ইচ্ছায় স্বাধীনভাবে কেনাকাটা করতে পারেন। নিজস্ব রোজগার না থাকতে পারে কিন্তু কেনাকাটায় স্বাধীনতা আছে। স্বামীর কাছ থেকে পুজোর কেনাকাটার বরাদ্দ অর্থ দিয়ে স্বাধীনভাবে নিজের পছন্দমতো কেনাকাটা করে থাকেন। সাধারণত বাঙালির জীবনে বছরে দু'বার বড় করে কেনাকাটা হয় — এক নববর্ষে দুই পুজোয়। তবে হ্যাঁ, বর্তমান দিনে বেশির ভাগ মহিলারা চাকরিরতা হওয়ায় সারা বছরই কেনাকাটা করেন। চৈত্র মাসের সেলে অনেকেই পুজোর বাজার অগ্রিম করে রাখেন। বিশেষত, যাদের দেওয়ার ব্যাপারটা থাকে। আগে পুজোর অর্থাৎ মহালয়ার কিছুদিন আগে স্বামীর অফিসের বোনাস হলে গিন্নিরা যেতেন বাজারে। বড় বড় দোকানগুলোতে বিজ্ঞাপনের চমক, টিভি-র পর্দায় নানারকম চমকদারি বিজ্ঞাপন দেখে অনেক মহিলারাই উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন এবং সেই দোকানে গিয়ে বিজ্ঞাপনের জিনিসটাকে কিনে নিতে চান পাঁচজনের মধ্য থেকে। এছাড়া বর্তমান দিনে ক্রেডিট কার্ড -এর ফলে যখন-তখন মহিলারা দোকানে গিয়ে চাহিদা অনুযায়ী একের পর এক কিনে আনেন। এই মাত্রাছাড়া কেনাকাটা কিন্তু এক ধরনের পাগলামি। অতিরিক্ত লোভ কিন্তু সংসারের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা সৃষ্টি করে। এ ব্যাপারে মনোবিদদের বক্তব্য হল যে, অতিরিক্ত কেনাকাটা অনেক সময়ে মানসিকভাবে অসুস্থ করে তোলে, কিন্তু ক্রেতা মহিলারা সেটা বুঝতে পারে না অর্থাৎ একটা আসক্তি জেগে ওঠে। অথচ, কার্যত হয়ত সেগুলো বাড়ি গিয়ে যে ব্যবহার করবেন তাও নয়। মনোবিদদের মতে, এ ধরনের মহিলারা মানসিকভাবে অসুস্থ। শেষ পর্যন্ত

*জোর কদমে চলছে পুজোর কেনাকাটা।*

তাদের ট্রিটমেন্টের জন্য ক্লিনিকে আসতে হয়।

এটা ঠিক, চিরকালই মেয়েরাই কেনাকাটা করে থাকেন। কারণ, মেয়েদের মধ্যে ইমোশনাল পার্টটা বেশি। এছাড়া তাদের রুচিটাও ভাল। আর সবচেয়ে যেটা বড় সেটা হল, গেরস্থালি মহিলারা সারাদিন বাড়িতে থাকার ফলে পরিবারের সদস্যদের রুচি ভাল লাগার ব্যাপারটা বুঝতে পারেন। আসলে, সব কিছুর মধ্যেই একটা বাজেট থাকা দরকার। যত টাকার অঙ্কের বাজার করা হোক না কেন, অবশ্যই নির্দিষ্ট সীমা রাখা চাই — কখনই লাগামছাড়া হওয়াটা ঠিক নয়।

শুধুমাত্র শাড়ি কেনার ব্যাপারে নয় ছেলে-মেয়েদের, পোশাক কেনার ক্ষেত্রেও তাঁদের নজর থাকা দরকার। ছেলে-মেয়েকে মানাবে এমন পোশাক কিনবেন। বাজারে চলছে বা বিজ্ঞাপনে চমক দিচ্ছে এমন পোশাক কখনই কিনবেন না যদি না তা আপনার সাধ্যের মধ্যে না হয় বা আপনার সন্তানকে না মানায়। আরেকটা দিকে নজর রাখতে হবে, আপনার সামর্থ্য থাকলেও সন্তানকে খুব দামি পোশাক কিনে দেবেন না, কারণ, সে আর পাঁচজন ছেলে-মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করে। এতে ওর মধ্যে সুপিরিওরিটি দেখা দেবে। এদের এই বয়স পারস্পরিক মেলামেশার বয়স। এর ফলে ওরা মূল্যায়ন করতেও শিখবে না।

এই সঙ্গে ক্রেডিড কার্ডের মোহে ঋণের বোঝা বাড়িয়ে তুলবেন না। পুজোর জন্য কেনাকাটার আনন্দকে বিষাদে পরিণত করবেন না। এ এক সর্বনেশে নেশা। এই নেশা মহিলাদের স্বাভাবিকত্ব নষ্ট করছে। এইসব দেখতে দেখতে প্রবীণ গৃহবধূ স্বগতোক্তি করেই বলেন যে, আমরা দোকানে যেতাম না, বাড়িতেই তাঁতির কাছে একটা কাপড় কিনতাম। কিন্তু তার মধ্যে ছিল আন্তরিকতা, স্বতঃস্ফূর্ততা। এখন এত কিছু স্বাধীন ভাবে করেও এখনকার মহিলারা মানসিকভাবে তৃপ্ত নন। আরও চাই — প্রবণতা।

সুতরাং সব দিক বুঝে শুনে মহিলারা, সে গৃহবধূ থেকে শুরু করে চাকরিরতা যে হোন না কেন;সামঞ্জস্য রেখে সব কিছু করুন। মোহজালে নিজেকে হারাবেন না, বিজ্ঞাপনের চমকে ভুলবেন না। আর হাতে লিস্ট আর বাজেট রেখে মনের আনন্দে কেনাকাটার জন্য পা বাড়ান মন পছন্দ দোকানে।

## চিত্রকথা ॥ ভক্ত ও ভগবান ॥ আঠার

# ভারতীয় উপখ্যান কি শুধুই আষাড়ে গল্প ?

(১১ পাতার পর)

সমন্বয় প্রাচীন ভারতের জ্যোতির্বিদদের উন্নত চিন্তার সাক্ষ্য বহন করে।

তথ্য সূত্র :

১। Pocket Astronomy, Jenues Muirden, Kingfisher Books.
২। বিজ্ঞানের ইতিহাস, সমরেন্দ্রনাথ সেন, শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ।
৩। প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান, অরূপরতন ভট্টাচার্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
৪। আকাশ ও পৃথিবী, মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ।
৫। প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চা, রমেশ চন্দ্র মজুমদার ।
৬। ঋগ্বেদ সংহিতা, রমেশচন্দ্র দত্ত।
৭। মহাভারত।

*লেখক প্রথিতযশা বিজ্ঞান লেখক।*

Design's For Modern Living
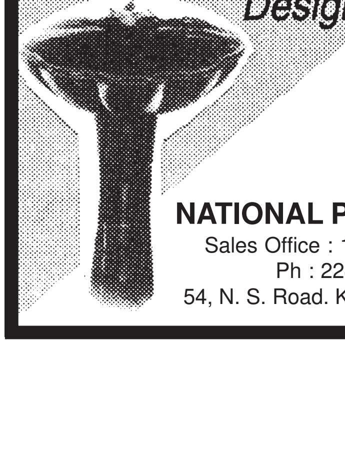
NEYCER
Neycer
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
Sales Office : 15, College Street, Kolkata-700012
Ph : 2241-7149 / 8174, 2237-1521
54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831 / 33

# স্বস্তিকা

## পুজো সংখ্যা ঃ ১৪১৫

### সৃজনশীল রচনায় পরিপূর্ণ
### এক অসামান্য পরম্পরার পুষ্পাঞ্জলি

**উপন্যাস**

**তনয়া**

**সৌমিত্র শঙ্কর দাশগুপ্ত**

এই আখ্যানের নায়িকা রিয়া। যাকে বিলাসপুর থেকে নিছক চাকরির খোঁজে আসতে হয়েছে কলকাতায়। কিন্তু প্রতিদিন এই মহানগরীর কাছে অপমানিত হচ্ছে সে। তাই আজ রিয়া চলে যাবে, কিন্তু এবার শান্তির সন্ধানে। কিন্তু কি ঘটনা ঘটেছিল রিয়ার জীবনে?

**মুক্তিপণ**

**শেখর বসু**

'আপনার কী মনে হয় কৌশিকদা, রনিকে কি সত্যি সত্যি অপহরণ করা হয়েছে? হতে পারে। নাকি ও নিজেই ওই অপহরণের গল্পটা চালু করেছে দাদুর কাছ থেকে কিছু টাকা আদায় করার জন্যে? গোয়েন্দার ঠোঁটে রহস্যময় একচিলতে হাসি ফুটে উঠেছিল, তদন্ত ভালভাবে শুরু করার আগে পর্যন্ত সব সম্ভাবনার দরজাই তো খোলা থাকে।'

**এই সময়**

**কণা বসু মিশ্র**

'নিজেকে খুব উঁচু মাপের মানুষ করে রেখেছে সৈকত। আর সীমান্তিনী ক্রমেই ওর কাছে ছোট হয়ে যাচ্ছে। তবুও সৈকতের জন্যই ছুটছে সে। কান্নার পুরু সর জমতে জমতে ওর বুকের মধ্যটা যেন গ্র্যানাইট পাথর হয়ে গেছে।'— এর সমাধান কোথায়? স্বামী মুক্তানন্দজীর মার্গদর্শন কী সীমান্তিনীকে পথ দেখাতে পারবে? দুই সন্তানের জননী যাজ্ঞসেনীরই বা কী হবে?

**স্বপ্নভঙ্গের এক করুণ কাহিনী**

**বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়**

এই দিল্লী আজকের নয়। মুঘল-পাঠানদের আমলের। এই দিল্লীর রাস্তার মোড়ে সামান্য গোলদারি দোকানের মালিক হেমকান্তি ভাগ্যের ফেরে সুলতানী সাম্রাজ্যের উজির হয়েছে। এখান থেকেই তার স্বপ্ন দেখা শুরু। স্বপ্ন দেখছে হিন্দু সম্রাট হওয়ার। তার স্বপ্ন কি বাস্তবে রূপায়িত হবে? নাকি স্বপ্নকে বাস্তবের রূপ দিতে গিয়ে সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে?

**প্রবন্ধ**

ভারতবর্ষ এক সাংস্কৃতিক রাষ্ট্র ❐ কে এস সুদর্শন
আত্মার রহস্য উন্মোচন জড়-বিজ্ঞানীদের পক্ষে অসম্ভব ❐ ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী
আয়ুর্বেদের পুনরুত্থান ঃ ভারতের কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা ❐ অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায়
ভ্রান্ত পথের পথিক ডিরোজিও ❐ ডঃ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়
মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ ফজলুল হক থেকে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ❐ ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ
শতবর্ষের আলোকে ১৯০৮ সালের বোমার গল্প ❐ অধ্যাপক রবি রঞ্জন সেন
স্বরাজের দাবিতে ইংলণ্ডে প্রথম সভা ❐ ডাঃ গুরুপদ শাণ্ডিল্য
বিপ্লবী বীর সাভারকর আজ উপেক্ষিত কেন? ❐ নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য
চতুর্থ পরিসর ও গণতন্ত্রে বিকৃতি ❐ তথাগত রায়
সন্ত্রাসদীর্ণ উত্তর-পূর্বাঞ্চল ❐ সুবীর ভৌমিক
অগ্নিপুরাণে ভারতীয় মনীষা ❐ ডঃ রবীন্দ্রনাথ বসাক
হিন্দুত্ব ❐ ডঃ প্রীতিমাধব রায়
গোর্খাল্যাণ্ড নির্ধারণের মাপকাঠি কি হবে? ❐ ডঃ বলরাম চক্রবর্তী

**গল্প**

ফরেনার ❐ এষা দে
সংসার সুখের হয় ❐ রমানাথ রায়
নিষ্ক্রমণ ❐ মানবেন্দ্র পাল
রফা ❐ সজল দাশগুপ্ত
বেঁচে থাকার অন্যমুখ ❐ দীপঙ্কর দাস
বিনোদ ঠাকুরের গল্প ❐ গোপালকৃষ্ণ রায়
মনের আয়নায় ❐ সুমিত্রা ঘোষ
তিমির বলয় ❐ গোপাল চক্রবর্তী
কিডন্যাপ ❐ বাদল ঘোষ

**দেবী প্রসঙ্গ**

দেবী বন্দনা ❐ ডঃ সীতানাথ আচার্য, শাস্ত্রী
শক্তি ছাড়া কি মা মহাশক্তির পূজা হয়? ❐ স্বামী যুক্তানন্দ

**রম্য-রচনা**

হুঁকো বার এক যৌন সুড়সুড়ির ব্যবসা ❐ চণ্ডী লাহিড়ী

**ইতিহাস আশ্রিত কাহিনী**

শিবাজী ও শাহজাদী ❐ ডঃ প্রসিত কুমার রায়চৌধুরী

**পৌরাণিকী**

মহাভারত কি ব্যাসদেবের আত্মজীবনী? ❐ মানিক চন্দ্র দাস

**দিব্যজীবন**

পুণ্য দর্শন মহেন্দ্রনাথ— জীবন চেনায় যারে ❐ অরিন্দম মুখার্জী

## মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হচ্ছে

### সত্বর কপি বুক করুন

● দাম চল্লিশ টাকা মাত্র ●

# বুড়ো ঘোড়া লাখ টাকা

**জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়**

গোটা দুনিয়া যেখানে 'ক্যাচ দেম ইয়ং' এই শ্লোগানকে বীজমন্ত্র করে সমস্ত ক্ষেত্রে তরুণদের জয়গান করছে, উঠে আসার পথ সুগম করছে সেখানে ভারতবর্ষ দাঁড়িয়ে আছে তার সেই চিরকালের ট্রাডিশন ধরে। সেই ট্রাডিশন কি না, যত বয়স বাড়ে ততই বাড়ে মানবিক দক্ষতা ও মনন। বয়সকে ধরে রেখে পারফরমেন্সের নিত্যনতুন

**খেলার জগৎ**

মানদন্ড রচনা এ বোধহয় শুধু এদেশেই সম্ভব। না হলে এখনও কিভাবে লিয়েন্ডার পেজ কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে দু-দুটো ফাইনালে লড়ার জীবনীশক্তি খুঁজে পান। এখনও বাইচুঙ ভুটিয়া, শচীন তেন্ডুলকরের ক্রীড়া দক্ষতার ওপরই নির্ভরশীল হয়ে থাকে জাতীয় ফুটবল ও ক্রিকেট দল? বিশ্বনাথন আনন্দকেই বা বাদ দেবেন কীভাবে? যদিও দাবায় বয়সটা কোনও ফ্যাক্টর নয়, কিন্তু ইদানিং বিশ্ব দাবায় তরুণ তুর্কী রাজই যে চলছে।

লিয়েন্ডার পেজ নামটা শুনলেই সম্ভ্রম ও আবেগে শরীরের পরতে পরতে রোমাঞ্চ তৈরি হয়। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সেও কী অ্যাথলেটিক ক্ষিপ্রতা ও রিফ্লেক্স, উঠতি যে কোনও ক্রীড়াবিদের আদর্শ হওয়া উচিত। বছরের শেষ গ্রান্ডস্লাম যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে মিক্সড ডাবলস ও ডাবলস দুটো ক্ষেত্রেই ফাইনালে ওঠেন এবং কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে দুটো ম্যারাথন সেমিফাইনালে শেষ মুহূর্তপর্যন্ত স্নায়ুর চাপ সামলে। জিম্বাবোয়ের মেয়ে বিখ্যাত ব্লাক ভাইদের ছোট বোন কারা ব্লাককে নিয়ে মিক্সড ডাবলস খেতাব জিতে কেরিয়ারে অষ্টম গ্রান্ডস্লামটি তুলে নিলেন ফ্লাসিং মিডো থেকে। অবশ্য তাঁর থেকে তিনটি বেশি গ্রান্ডস্লাম খেতাব রয়েছে মহেশ ভূপতির। লিয়েন্ডার অবশ্য অলিম্পিক, ডেভিসকাপ ও পেশাদার সার্কিট মিলিয়ে যে পরিমাণ সাফল্য পেয়েছেন, তার পাশে মহেশ কিছুটা হলেও গুরুত্ব গৌরবে পিছিয়ে।

লিয়েন্ডারের একমাত্র অধরা ডাবলসে অলিম্পিক খেতাব। মহেশের সঙ্গে জুটিতে দুবার ফরাসী ওপেন, একবার উইমবলডন জিতেছেন। জিতেছেন অসংখ্য এ টি পি টুর্ণামেন্ট। নিজে সিঙ্গলসে অলিম্পিক ব্রোঞ্জ পেয়েছেন। কিন্তু একদা বিশ্বসেরা জুটি লি-হেসের অলিম্পিক পদক বোধ হয় অধরাই থেকে গেল। ২০১২-র লন্ডন অলিম্পিয়াডে দুজনেরই নামার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। এই একটি ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, শূন্যতা ছাড়া লিয়েন্ডার বিশ্ব টেনিসে যে কীতিকল্প স্থাপন করেছেন এবং এখনও করে যাচ্ছেন তা দেখে বলতে হয় মাইকেল মধুসূদনের যথার্থ বংশধরই বটে, তাঁর হাতেই মানায় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার।

অন্যদিকে দেখুন বাইচুঙ ভুটিয়া ও শচীন তেন্ডুলকরকে। ফুটবল ও ক্রিকেটের মতো দলগত খেলাকেও 'ওয়ান ম্যান শো'করে তুলেছেন এই দুজন। ১৯৮৯ থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছেন শচীন। কুড়ি বছরেও হারাননি নিখুঁত টেকনিক ও রান করার স্পৃহা। 'রানিং বিটুইন দ্য উইকেটে' এখনও সাবলীল। কবার রান আউট হন, হাতে গুনে বলে দেওয়া যাবে। ব্রেট লি, স্টুয়ার্ট ক্লার্ক, মাইকেল জনসনের পেস ব্যাটারি সামলে অস্ট্রেলিয়ার দ্রুত, বাউন্সি উইকেটে এখনও সিরিজে সবচেয়ে বেশি রান করেন দলের মধ্যে। একদিনের ক্রিকেটের চরিত্র বিরোধী আবহে নিজের খেলার ছাঁচ ধরে রেখে প্রয়োজনীয় সব শর্ত পালন করে রান করেন এবং তিনি বড় রান পেলেই ভারত জেতে। তার প্রমাণ গত অস্ট্রেলিয়া সফরে ভি বি একদিনের সিরিজ। অস্ট্রেলিয়ার মাঠ থেকে প্রথম কোনও ভারতীয় দল একদিনের সিরিজ জিতে এল, তা ওই মারাঠা মধ্য তিরিশের ব্যাটের ওপর ভর করেই।

চুনী গোস্বামীরা যতই বাইচুঙের ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তায় ইর্ষান্বিত হন এবং তাঁর সাফল্যকে প্রত্যাশিত গুরুত্ব ও স্বীকৃতি না দিক, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই বিশ্ব পর্যায়ে খেলার সুযোগ পাওয়া এই সিকিমিজ যুবক সব অর্থেই আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব। চুনী, পি কে ব্যানার্জি, শৈলেন মান্নারা অনেক বড় খেলোয়াড় ছিলেন বাইচুঙের তুলনায়। তারা অলিম্পিকেও খেলেছেন, এশিয়াডে ভারতকে সোনা জিতিয়েছেন, কিন্তু বিশ্ব একাদশ দলে এরা কেউই কি সুযোগ পেয়েছেন বাইচুঙের মতো। বাইচুঙ মিউনিখে বিশ্ব একাদশ দলে শুধু খেলার সুযোগ পেয়েই থেমে থাকেননি, গোলও করেছেন। ব্রাজিলের রোনাল্ডো, ইংল্যান্ডের জর্ণটেরি, জামানির মাইকেল

*লিয়েণ্ডার পেজ*

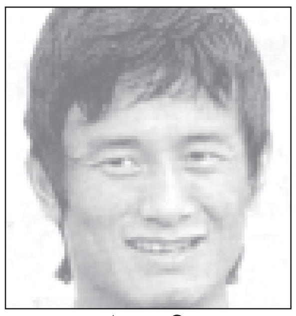

*বাইচুং ভুটিয়া*

*শচীন তেণ্ডুলকর*

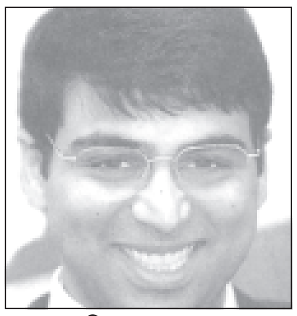

*বিশ্বনাথন আনন্দ*

বালাক, ফ্রান্সের পিরেসের পাশে ভারতের বাইচুঙ খেলেছেন, ফিফা আয়োজিত ম্যাচে, এ ব্যাপার কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করা সম্ভব।

আর ২০০২, ২০০৭, ২০০৮ এই তিন বছরে তিনটে আন্তর্জাতিক টুর্ণামেন্ট জিতেছে ভারত। ২০০৩ -এ আসিয়ান ক্লাব টুর্ণামেন্টও এসেছে ভারতে ইষ্ট-বেঙ্গলের চাম্পিয়ন হবার সুবাদে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে জয়ের নেপথ্য কারিগর বাইচুঙ। কম বয়সী ফুটবলার হিসেবে বাইচুঙ যখন ভারতীয় দলে সুযোগ পান তখন বিজয়ন, আনচেরিরা আলো করে রয়েছেন জাতীয় দলে। তার মধ্যেও বাইচুঙও নিজের জাত চিনিয়েছেন। টানা বছর ১৩ জাতীয় দলে অপরিহার্য অঙ্গ। এখনও ৩৩ বছর বয়সেও সুনীল ছেত্রী, স্টি ফেন ডায়াস, এন পি প্রদীপদের টপকে জাতীয় দলের টপ স্কোরার হন। তিনি না খেললে বব হাউটনের টিম গাড্ডায় পড়ে যায়। তরুণ ব্রিগেড চোখে সর্ষেফুল দেখে। বাইচুঙ নামলেই দলের খেলার চেহারাই পাল্টে যায়। সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত সাম্প্রতিক এ এফ সি চ্যালেঞ্জ কাপ সেখানে বাইচুঙের ঔজ্জ্বল্যে সবাই ঢাকা পড়ে যান। লিয়েন্ডার, শচীন, বাইচুঙের মতো দুটো যুগ ধরে ভারতবর্ষের ক্রীড়া সংস্কৃতির জোয়াল টেনে চলেছেন বিশ্বনাথন আনন্দ। ৮৮-তে পরিপূর্ণ গ্রান্ডমাস্টার হন মাত্র কুড়ি বছর বয়সে। তার চেয়ে কম বয়সে গ্রান্ডমাস্টার হবার কৃতিত্ব রয়েছে শুধু একজনেরই — তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব নেওয়া রুশ দাবাড়ু নাতা কামাস্কি।

এ ব্যাপারে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ দাবাড়ু তথা বুদ্ধি মান মানুষ ববি ফিশারকেও পিছনে ফেলে দিয়েছেন আনন্দ। তারপরের ঘটনা তো সাফল্যের বিরামহীন পথ পরিক্রমা। পৃথিবীর প্রায় সব খেতাব করায়ত্ত আনন্দের, দুবার বিশ্ব চাম্পিয়ন হয়েছেন, আরও দুবার ফাইনালে উঠে রানার্স। কোরাস, ডটমুন্ড, মেইঞ্জ, লিনারেস, মোনাকো সহ বিশ্ব দাবার সব গ্রাপ্রি টুর্ণামেন্টে একাধিকবারের বিজয়ী চেন্নাই তনয় গত কয়েক বছর ধরে স্পেনের মাদ্রিদই তাঁর বাসভূমি। একমাত্র অধরা অলিম্পিয়াড সোনা। এই একটি ক্ষেত্রে তাঁকে টেক্কা মেরে দিয়েছেন প্রিয় বন্ধু ও স্বদেশে সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী দিব্যেন্দু বড়ুয়া।

স্বধীন ভারতবর্ষের সর্বকালের সেরা ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব কে, প্রশ্নটি করলে নির্দ্ধিধায় উঠে আসবে তাঁর নাম। প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে যেমন ধ্যানচাঁদ, স্বাধীনোত্তর ভারতে তেমন বিশ্বনাথন আনন্দ। হকির কে ডি সিং বাবু, লেসলি ক্লডিয়াস স্বাধীন ভারতের জন্য অলিম্পিক সোনা এনেছেন তিনবার করে, কিন্তু তাদের টপকে বিশ্বানাথন আনন্দের মাথায় এই মুকুটটি পরালে ওজর-আপত্তি করার লোক বিশেষ পাওয়া যাবে না। কারণ বাবু ক্লডিয়াসদের সময় হকি বিশ্বজনীন ইভেন্ট হয়ে ওঠেনি। আর দাবা আফ্রিকার পিছিয়ে পড়া কয়েকটি দেশ ছাড়া প্রায় সব দেশেই খেলা হয় এবং খেলাটি সব অর্থেই এক স্বয়ংসম্পূর্ণ সাধনা। শারীরিক দক্ষতা ও ক্ষমতা লাগে যে কোনও শারীরবৃত্তিয় খেলার মতই আর মানসিক শক্তি, ধৈর্য, বৌদ্ধি ক উৎকর্ষতার চূড়ান্ত প্রতিফলন সমৃদ্ধ খেলা দাবা। এমন একটি খেলা যাকে খেলা না বলে পরিপূর্ণ জীবন সংস্কৃতি বলা যায়, সেই ক্ষেত্রে বিশ্বনাথন আনন্দ বিশ্ব পর্যায়ে সর্বকালের নিরিখে তিন নম্বরে আছেন প্রাপ্ত এলো রেটিংয়ে। চল্লিশ বছরেও যেন তাঁর খেলায় বসন্তের সৌরভ। মধ্যাহ্নের দীপ্তি। শুধু দাবা জগতেই নন, জীবনের যে কোনও ক্ষেত্রেই আদর্শ 'আইকন' তিনি।

## শব্দরূপ - ৪৮২

রুমকি সরকার

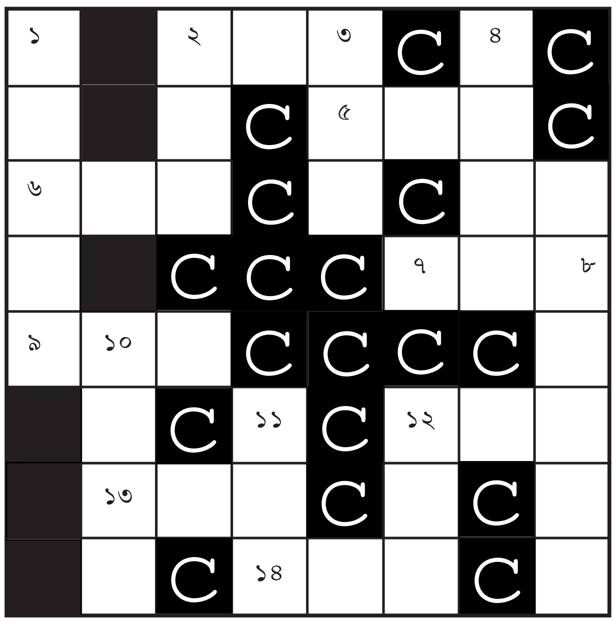

**সূত্র ঃ**

**পাশাপাশি ঃ** ২. আমেরিকার সম্ভাব্য রাষ্ট্রপতি, শেষ ঘরে জননী, ৫. ফারসি শব্দে ঢাক জাতীয় প্রাচীন রণবাদ্য, শেষ দুয়ে মাতুল, ৬. বিশেষণে মথিত করা, আলোড়ন, ৭. দাঁত পরিস্কার করার ছোট সরু কাঠি, ৯. সুন্দরী নারী, ১২. অসদাচরণ, শেষ দুয়ে ন্যায়, ১৩. ইঙ্গ শব্দে সমাধি দেওয়ার আগে মৃতদেহ রক্ষা করার বাক্স, ১৪. ওগো — নয়না হরিণী—।

**উপর-নীচ ঃ ১.** উত্তর কলকাতার এক থিয়েটার মঞ্চ বর্তমানে বন্ধ, ২. তৌল, ভারের পরিমাপ, ৩. বিলিতি মা, ৪. হাঁটু ও হাতের চেটোর সাহায্যে এগিয়ে চলা, দুয়ে জননী, ৮. তৎসম শব্দে সময়ক্ষেপ, সময় যাপন, প্রথম দুয়ে বধির, চারে ঠ্যাং, ১০. ফারসি শব্দে জাহাজের খালাশি, শেষ দুয়ে খাজনা, ১১. হিমালয় পত্নী, ১২. কুঠার।

সমাধান শব্দরূপ ৪৮০

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ব | ■ | ■ | স | ত্য | বা | ন | ■ |
| ল্ল | ■ | ■ | র | ■ | ল | ■ | ■ |
| ম | ত | ল | ব | ■ | ব | ছ | র |
| ■ | বি | ■ | ■ | ■ | ■ | লা | ■ |
| ■ | য় | ■ | ■ | ■ | ■ | ক | ■ |
| কা | ত | লা | ■ | তি | ন | লা | ফে |
| ■ | ■ | য়ে | ■ | ল | ■ | ■ | য়া |
| ■ | ম | ক | ম | ক | ■ | ■ | র |

**সঠিক উত্তরদাতা**

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

ভরত কুন্ডু
কলকাতা-৬

দেবলীনা গঙ্গোপাধ্যায়
হাওড়া, চারাবাগান।

বীরেন মাইতি
তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ৩ নভেম্বর ২০০৮ সংখ্যায়।

# পরলোকে কে. কে. হোজাই

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ অসম প্রান্তের উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার জেলা সঙ্ঘচালক প্রবীণ সমাজসেবী হাফলং নিবাসী কুম্ভকুমার হোজাই গত ৩ সেপ্টে স্বর দীর্ঘরোগ ভোগের পর পরলোক গমন করেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, ভারত বিকাশ পরিষদ, নববাসী কল্যাণ আশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

১৯৫২ সালে তিনি জেলা কাউন্সিলের নির্বাচনে হারাঙ্গাজাত কেন্দ্র থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিলেন। স্বশাসিত জেলা পরিষদের প্রধান হিসেবেও তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৬৬ সালে তিনি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ও প্রদেশ কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। তিনি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর উদ্যোগে এবং শিক্ষাবিদ যতীন্দ্রলাল থাউসেনের চেষ্টায় গীতা ও রামায়ণ ডিমাসা জনজাতিদের জন্য ডিমাসা ভাষায় অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৮৪ সালে নিউইয়র্কে এবং ১৯৮৭ সালে লন্ডনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব হিন্দু সম্মেলনে তিনি যোগদান করেছিলেন। এছাড়া তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশও ভ্রমণ করেছেন।

তাঁর মৃত্যুতে দেশ এক মহান কর্মযোগী ও হিন্দুত্বনিষ্ঠ সমাজসেবীকে হারাল। তাঁর এবং অন্যান্য অনেকের চেষ্টায় ডিমাসা জনজাতি সমাজ হিন্দুত্বকে আঁকড়ে রয়েছে।

स्वतन्त्रता दिवस
की
61वीं
वर्षगांठ
स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को
शत-शत नमन
के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं
स्वतंत्रता दिवस की 61वीं वर्षगांठ पर मैं प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। स्वतन्त्रता संग्राम के सभी शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देश की सीमाओं की रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा में अपने जीवन का बलिदान देने वाले उत्तराखण्ड के वीर सैनिकों को भी मैं कोटि-कोटि नमन करता हूँ। आइए, स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर समृद्ध एवं सुसंस्कृत उत्तराखण्ड के निर्माण का संकल्प दोहराएं।
मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी
ए.वी.एस.एम. (सेवा निवृत्त)
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड

# ভগবান তৈরির কারখানা